ব্ল্যাক হার্ট অ্যান্ড হোয়াইট হার্ট

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

অনুবাদ

আসাদুজ্জামান

ব্ল্যাক হার্ট অ্যান্ড হোয়াইট হার্ট

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

নিজের অর্জনক্ষমতার মধ্যে রয়েছে এমন কোনকিছুর জন্যে বাসনা হলে তা থেকে ফিলিপ হ্যাডেন নিজেকে কখনও বঞ্চিত করেনি।

শ্বেতাঙ্গ হ্যাডেন কেন দেশান্তরী হয়ে নাটালে এসেছিল তা কেউ জানে না। আইনের হাত এড়ানোর জন্যে একদিন সে সেখান থেকে বণিকের বেশে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়লো জুলুল্যান্ডে। রাজা সেটিওয়েইয়ো-র কাছে তাঁর দেশে শিকারের অনুমতি চাইতে গিয়ে কঠিন এক সমস্যার ফাঁদে পা দিয়ে বসলো।

জুলুদের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু জানে, সে আসলে তাদের হাতে বন্দী। বাগদত্তা নানিয়াকে না পাবার যন্ত্রণা জুলু সেনাপতি নাহুনকে অবিরত দগ্ধ করলেও হ্যাডেনকে সতর্ক প্রহরায় রেখেছে সে প্রতিটি মুহূর্ত। শাদা আর কালোদের যুদ্ধ যদি শুরু হয়ে যায়, হ্যাডেনের ভাগ্যে আছে নিশ্চিত দুর্ভোগ – হয়তো তাকে পিষে মউতি বানানো হবে রাজার আদেশে! পালাতে হবে তাকে, যে-করেই হোক।

কিন্তু বুড়ি ওবা 'মৌমাছি'র রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণী কি শুধু অর্থহীন কিছু বকুনি?

ব্ল্যাক হার্ট অ্যান্ড হোয়াইট হার্ট

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

অনুবাদ

আসাদুজ্জামান

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহ্‌নূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব
সেলিনা সুলতানা
প্রথম প্রকাশ
প্রজাপতি প্রকাশন
২০০০

প্রচ্ছদ
আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪

পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BLACK HEART AND WHITE HEART
By Henry Rider Haggard
Translated by Asaduzzaman

ISBN 984-462-689-7

মূল্য ॥ তেতাল্লিশ টাকা

রঙ্গন ও আদনান
অভিন্নহৃদয় দুই বন্ধুকে

এক

ফিলিপ হ্যাডেনকে যখন আমরা প্রথম দেখছি, সে-সময় তার পেশা মালামাল পরিবহন এবং জুলু দাস কেনাবেচা। বয়স চল্লিশের নিচে, চোখে পড়ার মতো সুদর্শন চেহারা। দীর্ঘদেহী ঋজু সে, গায়ের রঙ তামাটে। চোখদুটো তীক্ষ্ণ, মুখে খাটো ছুঁচলো দাড়ি, মাথায় কোঁকড়া চুল, সুগঠিত অবয়ব।

অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে তার জীবনে। আর তাতে এমন কিছু অধ্যায় আছে যার কথা এমনকি সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও সে বলেনি। তবে ভদ্র পরিবারের সন্তান সে, এবং শোনা যায়, ইংল্যান্ডে পাবলিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। সে যাই হোক, উপযুক্ত মুহূর্তে চিরায়ত সাহিত্য থেকে সাবলীলভাবে উদ্ধৃতি দিতে পারে হ্যাডেন, এবং এই গুণের সঙ্গে তার রয়েছে পরিশীলিত কণ্ঠ আর এমন ব্যক্তিত্ব যা কিনা পৃথিবীর দুর্গম সব অঞ্চলে বড়ো একটা চোখে পড়ার কথা নয়। এ-সবকিছুর জন্য তার কর্কশপ্রকৃতি সঙ্গীসাথীর কাছ থেকে সে পেয়েছে বিশেষ একটি নাম: 'রাজকুমার'।

এসব যা-ই যেমন হয়ে থাকুক না কেন, একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ফিলিপ হ্যাডেন দেশান্তরী হয়ে নাটালে এসেছিল কিছু একটা বিপাকে পড়ে। এবং এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, দেশে আত্মীয়স্বজন তার ভালোমন্দ নিয়ে আর মোটেই মাথা ঘামানোর দরকার মনে করে না।

উপনিবেশ কিংবা তার আশেপাশে যে পনেরো-ষোলো বছর হ্যাডেন কাটিয়েছে, সে-সময়ের মধ্যে নানা কাজকর্মে হাত লাগিয়েছে, কিন্তু কোনকিছুতেই ভালো করতে পারেনি। চালাক-চতুর লোক সে, আচার-আচরণে অমায়িক এবং আকর্ষণীয় – নতুন করে জীবন শুরু করার প্রয়োজনে সবসময় সহজেই বন্ধুবান্ধব খুঁজে নিতে পেরেছে। কিন্তু প্রতিবারই একটু একটু করে তার ওপর ক্ষীণ একটা অবিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছে বন্ধুদের মনে, এবং কিছুদিন মোটামুটি লেগে থাকার পর একদিন সে নিজের রচিত পথ নিজেই রুদ্ধ করে দিয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। পেছনে রেখে গেছে তার স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে সন্দেহের কিছু অবকাশ এবং কিছু অপরিশোধিত দেনা।

হ্যাডেনের জীবনের সবচেয়ে বিচিত্র সব ঘটনাসমষ্টি নিয়ে এই কাহিনীর যখন শুরু, তার আগে কয়েক বছর ধরে সে মালামাল পরিবহনের কাজ করে এসেছে। কাজটা হলো, ষাঁড়-টানা গাড়িতে করে ডারবান কিংবা ম্যারিট্জবার্গ থেকে প্রত্যন্ত সব অঞ্চলে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া। জীবনে একাধিকবার যে-ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে হ্যাডেন, সে-ধরনেরই এক সমস্যার কারণে তাকে সাময়িকভাবে এই উপার্জনকর্ম ত্যাগ করতে হয়।

দুই ওয়্যাগনভর্তি নানারকম পণ্য নিয়ে সে ট্র্যান্স্‌ভালের ছোট্ট সীমান্ত-শহর ইউট্রেখটে এসেছিল সেখানকার এক দোকান-মালিককে পৌঁছে দিতে। দেখা গেল, ছয় কেস ব্র্যাণ্ডির মধ্যে পাঁচ কেস তার ওয়্যাগন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হ্যাডেন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলো তার কাফ্রি 'ছোকরা'দের ওপর দোষ চাপিয়ে। কিন্তু দুর্মুখ দোকানি তাকে প্রকাশ্যে চোর ব'লে গালাগাল দিয়ে জানিয়ে দিলো, কোন মালপত্রের ভাড়াই সে দেবে না। বাদানুবাদ থেকে ঘুসোঘুসি শুরু হলো, তারপর ছুরি বেরিয়ে এলো দু'জনের হাতে। অন্য কেউ এসে বাধা দেবার আগেই দোকানির দেহের একপাশে বিশ্রী একটা জখম তৈরি হয়ে গেল।

বিষয়টা নিয়ে ল্যান্ডড্রস্ট কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত শুরু হতে পারার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সে-রাতেই সরে পড়লো হ্যাডেন। ষাঁড়গুলোকে যতো জোরে ছোটানো সম্ভব ছুটিয়ে নাটালে ফিরে গেল। সেখানেও থাকা নিরাপদ নয় বুঝতে পেরে একটা ওয়্যাগন নিউক্যাসলে রেখে অন্য ওয়্যাগনটাতে কাফ্রিদের জন্যে কম্বল, ক্যালিকো, লোহালক্কড়ের জিনিসপত্র ইত্যাদি নানান সামগ্রী বোঝাই করে সীমান্ত পেরিয়ে জুলুল্যান্ডে ঢুকে পড়লো। শেরিফের কোন অফিসারের পক্ষে সেখানে তার পিছু নিয়ে যাওয়া সে-সময় সম্ভব ছিল না।

স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা ও রীতিনীতির সঙ্গে সুপরিচিত ছিল হ্যাডেন – বেশ ভালো ব্যবসা হলো। পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে অচিরেই সে কিছু নগদ টাকা এবং ছোট একপাল গরুর মালিক হয়ে গেল। এর মধ্যে তার কানে এলো, যে লোকটাকে সে জখম করেছিল, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সে এখনও পণ করে আছে এবং নাটালের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। এসব কারণে আপাতত সভ্যজগতে ফেরা উচিত বলে সে ভাবছে না। ওদিকে নতুন মালপত্রের সরবরাহ না পেলে ব্যবসাও আর চালানো সম্ভব নয়। এ-অবস্থায় হ্যাডেন বিজ্ঞজনের মতো আমোদপ্রমোদে মন দেবার সিদ্ধান্ত নিলো।

গরুর পাল ও ওয়্যাগন সীমান্তের ওপারে চেনাশোনা এক স্থানীয় মোড়লের জিম্মায় পাঠিয়ে দিয়ে সে পায়ে হেঁটে উলুনডি রওনা হলো। উদ্দেশ্য, রাজা সেটিওয়েইয়ো-র কাছ থেকে তাঁর দেশে শিকারের অনুমতি নেবে।

ইনদুনা, অর্থাৎ মোড়লেরা তাকে বেশ অমায়িকভাবে স্বাগত জানালো দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো হ্যাডেন – কারণ ১৮৭৮ সালে জুলু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তার এই আগমন। রাজা সেটিওয়েইয়ো এরই মধ্যে ইংরেজ ব্যবসায়ী ও অন্যান্যের প্রতি বিরাগ দেখাতে শুরু করেছেন, যদিও রাজার এই মনোভাবের কারণ তাদের অজানা রয়ে গেছে।

কারণটা সম্পর্কে হ্যাডেন মৃদু আভাস পেলো সেটিওয়েইয়োর সঙ্গে তার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকারের সময়। রাজার ক্রালে পৌঁছবার পর দ্বিতীয় দিন সকালে একজন দূত এসে জানালো, 'হস্তিপ্রবর – যাঁর পদভারে জগৎ কম্পমান' তাকে অনুগ্রহ করে সাক্ষাৎ দেবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। দূতের পিছু পিছু হাজার হাজার কুটিরের ভেতর দিয়ে পথ করে 'মহাভূমি' পার হয়ে ছোট একটা প্রাচীরবেষ্টিত জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো হ্যাডেন। চিতাবাঘের চামড়ার *কারোস* পরিহিত রাজোচিত চেহারার একজন জুলু সেখানে ছোট একখানা চৌকির ওপর

বসে আছেন। ইনিই সেটিওয়েইয়ো – তাঁকে ঘিরে বসে থাকা উপদেষ্টাদের সঙ্গে *ইনদাবা*, অর্থাৎ সভা করছেন।

যে-ইনদুনা হ্যাডেনকে রাজসন্নিধানে নিয়ে এসেছে সে হাত ও হাঁটু মুড়ে মাটিতে উবু হয়ে রাজসম্ভাষণ *বায়েত* জ্ঞাপন করলো। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে জানালো, শাদা মানুষ সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছে।

'অপেক্ষা করুক সে,' ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন রাজা। তারপর মুখ ফিরিয়ে আবার পারিষদদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন।

আগেই বলা হয়েছে, জুলু ভাষা পুরোপুরি বুঝতে পারে হ্যাডেন। মাঝে মাঝে রাজা যখন উঁচু গলায় কথা বলছেন, কিছু কিছু কথা তার কানে এসে পৌঁছুচ্ছে।

'কী!' সেটিওয়েইয়ো বলে উঠলেন তাঁর সামনে দাঁড়ানো এক জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে। 'আমি কি কুকুর যে এই শাদা হায়েনাগুলো আমাকে এভাবে খুবলে খাবে? এই রাজ্য কি আমার নয় – আমার আগে কি আমার বাবার ছিল না? এখানকার মানুষকে বাঁচাবার বা মারবার অধিকার কি আমারই নয়? আমি বলে দিচ্ছি, এই শাদা ইতর মানুষগুলোকে আমি পায়ে পিষে মারবো, আমার যোদ্ধারা তাদের গ্রাস করবে। আমি বলে দিলাম!'

শীর্ণদেহ বুড়ো লোকটা ব্যাকুলভাবে কিছু একটা রাজাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। তার ভূমিকাটা স্পষ্টতই শান্তিপ্রস্তাবকের। আবার কথা বলে উঠলো সে। হ্যাডেন লোকটার কথা শুনতে না পেলেও দেখতে পাচ্ছে তাকে। উঠে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে ইশারা করছে বুড়ো। তার অঙ্গভঙ্গি ও করুণ মুখভাব দেখে মনে হচ্ছে, সে ভবিষ্যদ্বাণী করছে, যদি কোন একটা বিশেষ কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয় তাহলে ঘোর বিপর্যয় নেমে আসবে।

রাজা কিছুক্ষণ নীরবে তার কথা শুনলেন, তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে। রাগে দু'চোখ জ্বলছে তাঁর।

'শোনো,' চিৎকার করে বললেন তিনি উপদেষ্টাকে, 'অনেকদিন ধরেই ব্যাপারটা অনুমান করছিলাম আমি, আজ স্পষ্ট বুঝে গেছি। তুমি বিশ্বাসঘাতক। সম্পসিউ (স্যার থিওফিলাস শেপস্টোন)-এর কুকুর তুমি, নাটাল সরকারের কুকুর। নিজের ঘরে অন্যের কুকুর রেখে তাকে কামড়াতে দেবো না আমি। নিয়ে যাও একে!'

বৃত্তাকারে বসে থাকা ইনদুনাদের মুখ থেকে তাদের অজান্তেই অস্ফুট একটা গুঞ্জন বেরিয়ে এলো। কিন্তু বৃদ্ধ একটুও চমকালো না। এমনকি সৈন্যরা যখন এগিয়ে এসে তাকে শক্ত করে চেপে ধরলো অবিলম্বে হত্যা করতে নিয়ে যাবে বলে, তখনও সে অবিচল রইলো। কয়েক মুহূর্তের জন্যে, পাঁচ সেকেণ্ডের জন্যে হবে হয়তো, সে পরনের কারোসের কোণ দিয়ে মুখ ঢেকে রইলো। তারপর মুখ তুলে রাজার দিকে তাকিয়ে কথা বলে উঠলো স্পষ্ট স্বরে।

'হে রাজা,' বলে চললো সে, 'আমি অতি বৃদ্ধ একজন মানুষ। যুবক বয়সে আমি সিংহপ্রতিম চাকা-র অধীনে দায়িত্বপালন করেছি। মৃত্যুশয্যায় তিনি

শাদা মানুষদের আগমনের কথা বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা-ও আমি শুনেছি। তারপর শাদা মানুষেরা এলো। দিনগান-এর বাহিনীতে রক্ত নদীর যুদ্ধে আমি লড়াই করেছি। দিনগানকে ওরা হত্যা করে – তারপর বহু বছর আমি ছিলাম আপনার পিতা পানডা-র উপদেষ্টা। হে রাজা, তুগেলার যুদ্ধে আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়েছি, সে-নদীর ধূসর জল যেদিন আপনার ভাই উমবুলাজি আর তাঁর শতসহস্র যোদ্ধার রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। পরে আপনার উপদেষ্টা হলাম আমি, হে রাজা, এবং সম্পসিউ যেদিন আপনার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন, আর আপনি কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সম্পসিউকে, সেদিনও আমি আপনার সঙ্গে ছিলাম। সেসব প্রতিশ্রুতি আপনি রক্ষা করেননি। আজ আপনি আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন, সেটা স্বাভাবিক; কারণ আমি খুবই বৃদ্ধ হয়েছি, আমার কথাবার্তা যে নির্বোধের মতো শোনাবে তাতে সন্দেহ নেই, বুড়ো বয়সে এরকমই হয়ে থাকে। তবু আমার বিশ্বাস, আপনার পিতামহের ভাই চাকা-র ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়ে উঠবে, শাদা মানুষেরা আপনাকে পরাভূত করবে, তাদের কারণেই আপনার মৃত্যু ঘটবে। যদি পারতাম, আরও একবার যুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার জন্যে লড়াই করতাম, হে রাজা, কারণ যুদ্ধ তো আপনাকে করতেই হবে। তবে যে পরিসমাপ্তি আপনি আমার জন্য নির্বাচন করবেন, সেটাই আমার জন্য সর্বোত্তম পরিসমাপ্তি। আপনার নিদ্রা নির্বিঘ্ন হোক, হে রাজা। বিদায়। *বায়েত*!'

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করলো। সবাই আশা করছে, স্বৈরশাসক তাঁর রায় পরিবর্তন করবেন। কিন্তু করুণাপ্রদর্শনের অভিরুচি রাজার হলো না, কিংবা রাজবিধি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কাছে হার মানলো অনুকম্পা।

'নিয়ে যাও একে,' আবার বলে উঠলেন রাজা।

বৃদ্ধের মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠলো। 'শুভরাত্রি,' একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো সে। একজন সৈন্যের বাহুতে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে বধ্যভূমির দিকে রওনা হয়ে গেল বৃদ্ধ যোদ্ধা ও রাষ্ট্রনীতিক।

ভীতিমিশ্রিত বিস্ময় নিয়ে সবকিছু দেখলো ও শুনলো হ্যাডেন। 'নিজের লোকদের সঙ্গে যদি রাজা এ-রকম আচরণ করেন, তাহলে আমার কী হবে?' মনে মনে বললো সে। 'নাটাল থেকে আমার চলে আসার পর আমরা ইংরেজরা নিশ্চয় কোন কারণে রাজার বিরাগভাজন হয়ে উঠেছি। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার ইচ্ছে বা অন্য কোন মতলব আছে নাকি তাঁর? তাহলে তো এখানে আসা আমার ঠিক হয়নি!'

চিন্তামগ্নভাবে মাটির দিকে চেয়ে ছিলেন রাজা। হঠাৎ মুখ তুলে তাকালেন। 'আগন্তুককে এখানে নিয়ে এসো,' বলে উঠলেন তিনি।

হ্যাডেন তাঁর কথা শুনতে পেলো। এগিয়ে গিয়ে যতটা সম্ভব শীতল এবং নির্বিকার ভঙ্গিতে সেটিওয়েইয়োর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

তাকে কিছুটা অবাক করে দিয়েই রাজা গ্রহণ করলেন তার হাত। 'তুমি *উমফাগোজান* (ইতরজন) নও অন্তত, শাদা মানুষ,' অতিথির দীর্ঘ ছিপছিপে দেহকাঠামো আর সুছাঁদ মুখাবয়বের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন রাজা, 'সর্দারের জাতের তুমি।'

'হ্যাঁ, রাজা,' ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দিলো হ্যাডেন, 'আমি সর্দারের জাতের।'

'আমার দেশে কী চাও তুমি, শাদা মানুষ?'

'খুব সামান্য, রাজা। কিছুদিন ধরে আমি এখানে ব্যবসা করছি – আপনি হয়তো তা শুনেও থাকবেন। আমার সমস্ত মালপত্র বিক্রি হয়ে গেছে। এখন নাটালে ফিরে যাবার আগে কিছুদিন মোষ আর অন্যান্য বড়ো জানোয়ার শিকারের অনুমতি চাইতে এসেছি আপনার কাছে।'

'এ-অনুমতি আমি দিতে পারি না,' সেটিওয়েইয়ো উত্তর দিলেন। 'তুমি গুপ্তচর – সম্পসিউ পাঠিয়েছে তোমাকে; কিংবা নাটালে রানীর যে ইনদুনা আছে, সে পাঠিয়েছে। দূর হও তুমি।'

'ঠিক কথা,' হ্যাডেন বললো কাঁধ ঝাঁকিয়ে। 'তাহলে আশা করি নিজের দেশে ফিরে যাবার পর সম্পসিউ বা রাণীর ইনদুনা কিংবা তাঁদের দু'জনই আমাকে টাকাপয়সা দেবেন। তার আগ পর্যন্ত আপনার নির্দেশ তো আমাকে অবশ্যই মান্য করে চলতে হবে। তবে প্রথমে আপনাকে আমি একটা উপহার দিতে চাই।'

'কিসের উপহার?' রাজা জিজ্ঞেস করলেন। 'কোন উপহার চাই না আমার। এখানে ঢের আছে আমাদের, শাদা মানুষ।'

'ঠিক আছে, রাজা। জিনিসটা আপনার নেয়ার মতোও কিছু নয় – একটা রাইফেল মাত্র।'

'রাইফেল, শাদা মানুষ? কোথায় সেটা?'

'বাইরে। এখানে নিয়ে আসতাম, কিন্তু আপনার লোকেরা বললো, ''যাঁর পদভারে জগৎ কম্পমান সেই হস্তিপ্রবরের'' সামনে সশস্ত্র অবস্থায় এলে মৃত্যু অবধারিত।'

সেটিওয়েইয়ো ভ্রূ কোঁচকালেন, হ্যাডেনের কথার সুরে বিদ্রূপের আভাস তাঁর তীক্ষ্ণ কান এড়ায়নি।

'এই শাদা লোকটার উপহার হাজির করা হোক। জিনিসটা আমি দেখবো।'

হ্যাডেনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল যে ইনদুনা, সে তৎক্ষণাৎ তীরের বেগে ফটকের দিকে ছুট দিলো। এতো বেশি ঝুঁকে পড়ে দৌড়ুচ্ছে সে যে মনে হচ্ছে, প্রতি পদক্ষেপে একবার করে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। একটু পরেই অস্ত্রটা হাতে নিয়ে ফিরে এলো লোকটা, রাজার দিকে বাড়িয়ে দিলো। এমনভাবে ধরেছে সে রাইফেলটা যে সেটার নল সোজা তাক করা রয়েছে রাজার বুকের দিকে।

'অনুমতি পেলে বলি, হে হস্তিপ্রবর,' টেনে টেনে উচ্চারণ করলো হ্যাডেন, 'আপনার লোককে অস্ত্রের মুখটা আপনার বুকের দিক থেকে সরিয়ে নিতে বললে ভালো হয়।'

'কেন?' জানতে চাইলেন রাজা।

'কারণ শুধু এই যে, গুলি ভরা আছে ওতে, এবং গুলি ছোঁড়ার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরীও রয়েছে অস্ত্রটা – আপনি নিশ্চয় জগৎ-প্রকম্পন অব্যাহত রাখতে চান, হে হস্তিপ্রবর।'

কথাটা শোনামাত্র 'হস্তিপ্রবর' তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন, চৌকি থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলেন নিতান্ত অরাজোচিত ভঙ্গিতে। ওদিকে আতঙ্কিত ইনদুনা এক লাফে পিছিয়ে আসতে গিয়ে রাইফেলের ট্রিগারে হাত দিয়ে বসলো – বুলেট ছুটে গেল এক মুহূর্ত আগে যেখানে রাজার মাথাটি শোভা পাচ্ছিল ঠিক সেই জায়গা দিয়ে।

'নিয়ে যাও ওকে,' কুপিত রাজা চিৎকার করে উঠলেন ভূমিশয্যা থেকে। কিন্তু কথাটা তাঁর মুখ থেকে বেরোবার অনেক আগেই ইনদুনা 'জাদু-করা বন্দুক' বলে চিৎকার করে উঠে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণপণ বেগে ছুটে পালিয়েছে ফটক পার হয়ে।

'নিজেই নিজেকে নিয়ে গেছে সে,' মন্তব্য করলো হ্যাডেন, শুনে সমবেত লোকেরা চাপা স্বরে হেসে উঠলো। 'না, রাজা, ওটাকে অসাবধানে ধরবেন না, ওটা রিপিটিং রাইফেল। এই দেখুন –' বলে সে নিজেই হাতে তুলে নিলো উইনচেস্টারটা, ওপরের দিকে দ্রুত পরপর ছুঁড়ে দিলো বাকি চারটে বুলেট। প্রত্যেকটা বুলেট গিয়ে লাগলো যে-গাছটার দিকে সে লক্ষ্যস্থির করেছিল তার ডগায়।

'বাহ্, বাহ্, দারুণ!' বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো সবাই।

'শেষ হয়েছে?' জানতে চাইলেন রাজা।

'এখনকার মতো হয়েছে,' হ্যাডেন উত্তর দিলো। 'দেখুন জিনিসটা।'

সেটিওয়েইয়ো হাত বাড়িয়ে রিপিটারটা নিলেন, নল এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে তাঁর সবচেয়ে বিশিষ্ট কয়েকজন ইনদুনার ঠিক পেট বরাবর তাক করে অস্ত্রটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন সাবধানে। নিজেদের দিকে নলের মুখ ঘুরতে দেখে ইনদুনারা জড়োসড়ো হয়ে সরে যাচ্ছে একবার এদিকে, একবার ওদিকে।

'দেখলে তো, শাদা মানুষ, কেমন কাপুরুষ ওগুলো,' রাজা রুষ্ট স্বরে বললেন; 'ওদের ভয় হচ্ছে যদি আরও একটা গুলি এর মধ্যে থেকে যায়।'

'হ্যাঁ,' হ্যাডেন জবাব দিলো, 'সত্যি ওরা কাপুরুষ। আমার মনে হয়, চৌকিতে বসে থাকলে এইমাত্র মহারাজা যেমন ছিটকে পড়লেন ওরাও ঠিক তেমনি করে ছিটকে পড়তো।'

'বন্দুক বানানোর কায়দা-কানুন জানো তুমি, শাদা মানুষ?' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন রাজা, আর ইনদুনারা সবাই মাথা ঘুরিয়ে পেছনের বেড়া মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

'না, রাজা, বন্দুক বানাতে পারি না আমি, তবে মেরামত করতে পারি।'

'তোমাকে যদি ভালো বেতন দিই, শাদা মানুষ, তুমি কি আমার ক্রালে থেকে বন্দুক মেরামতের কাজ করবে?' সেটিওয়েইয়ো সাগ্রহে জানতে চাইলেন।

'সেটা হয়তো বেতনের ওপর নির্ভর করতো,' হ্যাডেন উত্তর দিলো; 'কিন্তু কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি, এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চাই। যদি রাজা আমার কথামতো শিকারের অনুমতি দেন, এবং কিছু লোকজন আমার সঙ্গে যেতে দেন, তাহলে ফিরে আসার পর হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলে দেখতে পারি। অনুমতি না পেলে আমি রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাটালের দিকে যাত্রা করবো।'

'এখানে যা দেখেছে-শুনেছে সেসবের বিবরণ দেবার জন্যে,' বিড়বিড় করে বললেন সেটিওয়েইয়ো।

এমন সময় বাধা পড়লো কথাবার্তায়। বৃদ্ধ ইনদুনাকে যে-সৈন্যেরা নিয়ে গিয়েছিল তারা এসে হাজির হলো সবেগে, রাজার সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

'মৃত্যু হয়েছে ওর?' জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

'রাজার সেতু পার হয়ে গেছে,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিলো সৈনিকের দল; 'রাজার প্রশংসাগীত গাইতে গাইতে মৃত্যুবরণ করেছে।'

'বেশ,' বললেন সেটিওয়েইয়ো, 'ও-পাথর আর আমার পায়ে চোট দেবে না। যাও, সম্পসিউকে আর নাটালে রাণীর ইনদুনাকে বলো গিয়ে ও-পাথর ছুঁড়ে ফেলে দেবার গল্প,' তীক্ষ্ণ তিক্ত স্বরে রাজা যোগ করলেন।

'*বাবা*! আমাদের পিতার বাক্য শোনো, হস্তিপ্রবরের হুঙ্কার শোনো,' রাজার কথার সূত্র ধরে বলে উঠলো ইনদুনারা। অন্য সবার চেয়ে বেশি তেজী একজন যোগ করলো: 'শিগ্‌গিরই আমরা আরেকটা গল্প শোনাবো ওদের, ওই বাচাল শাদা মানুষদের – রক্তের গল্প, বর্শার গল্প – ওদের কানে সে কাহিনী গেয়ে শোনাবে যোদ্ধার দল।'

কথাগুলো উত্তেজনা ছড়িয়ে দিলো শ্রোতাদের মধ্যে, যেমন করে আগুনের শিখা হঠাৎ ছেয়ে ফেলে শুকনো ঘাসের গুচ্ছকে। অধিকাংশ লোক পা মুড়ে মাটিতে বসে ছিল – লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সবাই, একসঙ্গে তালে তালে মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে বলে উঠলো:

ইনদাবা ইবম্‌য়ু – ইনদাবা ইয়ে মিকন্‌টো
লিজো দুন্‌ইসওয়া ঙ্গে ইমপি ন্‌দ্‌হেবেনি ইয়াহো।

(রক্ত-গাথা! রক্ত-গাথা! বর্শার এ আঁখ্যান
যোদ্ধারা সব ওদের কানে শোনাবে এই গান।)

বিশালদেহী ভয়ালদর্শন তামাটে চেহারার একজন তো হ্যাডেনের কাছে এসে তার চোখের সামনে মুঠি নাচাতে নাচাতে চিৎকার করে বলতে লাগলো কথাগুলো – ভাগ্য ভালো, রাজার সামনে রয়েছে বলে তার হাতে অ্যাসেগাই নেই।

রাজা দেখলেন, যে আগুন তিনি জ্বেলে দিয়েছেন তা খুব বেশি ভয়ঙ্করভাবে জ্বলে উঠেছে।

'থামো সবাই', গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন তিনি – বজ্রনির্ঘোষের মতো এই কণ্ঠস্বরের জন্যে তিনি বিখ্যাত। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি লোক যেন পাথর হয়ে গেল। শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে আসতে লাগলো তখনও: 'যোদ্ধারা সব ওদের কানে শোনাবে এই গান – শোনাবে এই গান।'

'পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এ-জায়গা আমার জন্যে নয়,' হ্যাডেন মনে মনে ভাবলো; 'ওই ইতরটার হাতে যদি অস্ত্র থাকতো তাহলে হয়তো সাময়িকভাবে কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যেতো ওর। – আরে! ওটা আবার কে?'

সে-মুহূর্তে প্রাচীরের ফটক দিয়ে উদয় হয়েছে জুলু পুরুষমূর্তির এক অনবদ্য নিদর্শন।

পঁয়ত্রিশ বছরের মতো বয়স হবে লোকটার, উমসিট্য়্য বাহিনীর একজন সেনাপতির পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত সে। ভ্রূর ওপর উদ্বিড়ালের চামড়ার বেষ্টনী থেকে উঁচু হয়ে আছে পাখির পালকের চূড়া। কোমর, বাহু ও হাঁটু থেকে ঝুলছে কালো ষাঁড়ের লেজের লম্বা ঝালর। এক হাতে ছোট একটা ঢাল, সেটার রঙও কালো। অন্য হাতটা খালি, কারণ অস্ত্র নিয়ে রাজার সামনে উপস্থিত হওয়ার বিধান নেই। চেহারায় লোকটা সুপুরুষ। দৃষ্টিতে এ-মুহূর্তে কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ পেলেও তার চোখদুটো সহজ ও অকপট। ঠোঁটের আদলে সংবেদনশীলতার ছোঁয়া স্পষ্ট। উচ্চতায় নিশ্চয় অন্তত ছ'ফুট দু'ইঞ্চি হবে সে, তবু প্রথমদর্শনে তাকে ঠিক লম্বা বলে মনে হয় না। এর কারণ সম্ভবত তার চওড়া বুক আর সুঠাম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সেগুলোর সঙ্গে অদ্ভুত বৈপরীত্য রয়েছে তার পেলব এবং প্রায় মেয়েলি ধাঁচের হাত আর পায়ের। সম্ভ্রান্ত জুলুদের মধ্যে প্রায়ই এমন দেখা যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, লোকটাকে দেখে যা মনে হচ্ছে তা-ই সে – আভিজাত্য, মর্যাদা আর সাহসের প্রতীক এক অরণ্যচারী পুরুষ।

যুবকের সঙ্গে সাধারণ মুচা আর চাদর পরিহিত আরেকজন লোক। ধূসর চুল দেখে বোঝা যায় তার বয়স পঞ্চাশের ওপর। তার চেহারাও সুশ্রী, এমনকি মার্জিত। তবে লোকটার চোখে ভীরুতার ছাপ, ঠোঁট ভাবলেশহীন।

'কারা এরা?' রাজা জানতে চাইলেন।

লোকদুটো তাঁর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে মাথা নুইয়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে অভিবাদন জানালো – মুখে উচ্চারণ করতে লাগলো *সিবংগা* বা প্রশংসাসূচক সম্বোধনমালা।

'কী চাও, বলো,' রাজা অধৈর্যের স্বরে বলে উঠলেন।

'হে রাজা,' তরুণ যোদ্ধা জুলু কায়দায় বসে বললো, 'আমি নাহুন, জমবা-র ছেলে। উমসিট্য়্য বাহিনীর একজন সেনাপতি আমি। ইনি আমার মামা, উমগোনা, আমার বাবার ছোট স্ত্রীর ভাই।'

সেটিওয়েইয়ো ভ্রূ কোঁচকালেন। 'নিজের দল ছেড়ে এখানে তুমি কী করছো, নাহুন?'

'অনুগ্রহ হোক মহারাজের – আমি প্রধান সেনাপতিদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। আমি এসেছি মহারাজের দানভাণ্ডার থেকে একটি দান ভিক্ষা করতে।'

'তাড়াতাড়ি কথা শেষ করো তাহলে, নাহুন।'

'শুনতে আজ্ঞা হোক, হে রাজা,' কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে সেনাপতি বললো: 'কিছুদিন আগে বাইরে আমার কিছু কাজের পুরস্কার হিসেবে মহারাজ দয়া করে আমাকে *কেশলা* উপাধি দিয়েছেন...' মাথার চুলে পরা একটা কালো আংটি স্পর্শ করলো সে। 'উপাধিপ্রাপ্ত পুরুষ হিসেবে এবং একজন সেনাপতি হিসেবে আমি রাজার অনুগ্রহভাজনের অধিকার প্রার্থনা করছি – বিবাহের অধিকার চাইছি।'

'অধিকার? আরেকটু বিনয়ের সঙ্গে কথা বলো, জমবার পুত্র; আমার সেনাদল আর পশুপালের অধিকার বলে কিছু নেই।'

ঠোঁট কামড়ালো নাহুন, গুরুতর একটা ভুল করে ফেলেছে।

'ক্ষমা করবেন, হে রাজা। ঘটনাটা এ-রকম: আমার এই মামা উমগোনার একটা সুশ্রী মেয়ে আছে। তার নাম নানিয়া। তাকে আমি স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই, সে-ও আমাকে স্বামী হিসেবে পেতে চায়। মহারাজের অনুমতিলাভের প্রত্যাশা নিয়ে আমি তাকে বাগ্‌দান করেছি এবং আন্তরিক এই অভিপ্রায় নিয়ে আমি উমগোনাকে পনেরোটা গরুবাছুর উপঢৌকন দিয়েছি। কিন্তু উমগোনার এক ক্ষমতাবান প্রতিবেশী আছে – মাপুতা নামে এক বৃদ্ধ সর্দার, ক্রোকোডাইল ড্রিফ্‌টের জিম্মাদার। মহারাজ তাকে নিশ্চয় চেনেন। এই সর্দারও নানিয়াকে বিয়ে করতে চায়। সেজন্যে সে উমগোনাকে জ্বালাতন করে, মেয়েটাকে তার হাতে তুলে না দিলে বহুরকম অনিষ্ট করবে বলে ভয় দেখায়। কিন্তু উমগোনার মন শাদা হয়েছে আমার প্রতি, মাপুতার প্রতি তার মন কালো। সেজন্যে আমরা দু'জন একসঙ্গে এসেছি মহারাজের কৃপা ভিক্ষা চাইতে।'

'হ্যাঁ, মহারাজ,' উমগোনা বললো, 'নাহুন যা বলেছে তা সত্যি।'

'থামো,' ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলেন সেটিওয়েইয়ো। 'বিয়ে করে স্ত্রী ঘরে আনার এটাই কি সময় আমার যোদ্ধাদের? স্ত্রীদের এই কি সময় জলের দিকে হৃদয় ফেরাবার? শুনে রাখো, মাত্র গতকাল একই অপরাধের জন্য – আমার অনুমতি ছাড়া উনডি বাহিনীর যোদ্ধাদের বিয়ে করার অপরাধের জন্য – বিশটি মেয়েকে ফাঁসি দেবার হুকুম দিয়েছি, তাদের এবং সেইসঙ্গে তাদের পিতাদের মৃতদেহ চৌরাস্তায় ফেলে রাখতে বলেছি, যাতে সবাই তাদের অপরাধের কথা জানতে পেরে সাবধান হয়ে যায়। হ্যাঁ, উমগোনা, তোমার এবং সেইসঙ্গে তোমার মেয়ের সৌভাগ্য যে, এই যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে দেবার আগে আমার অনুমতি চাইতে এসেছিলে। এখন আমার রায় শোনো: তোমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হলো, নাহুন – এবং, উমগোনা, বুড়ো সর্দার মাপুতাকে জামাতা করতে অস্বীকার করায় যেহেতু সে তোমাকে জ্বালাতন করছে, তার উপদ্রব থেকে তোমাকে নিষ্কৃতি দেবো। নাহুন বলেছে, মেয়েটা সুন্দরী – বেশ, আমি নিজেই তাকে অনুগ্রহ করবো, রাজগৃহের বধূদের একজন হবে সে। আজ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে,

এরপর নতুন চাঁদ উঠবে যে-সপ্তাহে, রাজ-অন্তঃপুর *সিগদ্‌হ্বায়* তাকে পৌঁছে দেবে। যে-গরুবাছুরগুলো নাহুন তোমাকে দিয়েছে সেগুলোও পৌঁছে দিয়ে যাবে একই সঙ্গে – রাজার অনুমতি ছাড়া বিয়ের কথা ভাবতে সাহস করায় নাহুনকে ওগুলো জরিমানা করা হলো।'

দুই

'বিচার বটে,' আদিম এই নাটক সাগ্রহে পর্যবেক্ষণ করতে করতে মনে মনে ভাবলো হ্যাডেন, 'এমন ফলাফল মোটেই প্রত্যাশা করেনি আমাদের প্রেমাতুর বন্ধুটি।' মুখ ঘুরিয়ে দুই কৃপাপ্রার্থীর দিকে তাকালো সে।

বৃদ্ধ উমগোনা একটু চমকে উঠেছে শুধু, তারপর রাজার অনুগ্রহ আর দাক্ষিণ্যের জন্য প্রথাগত ধন্যবাদ আর প্রশংসাসূচক বাক্য একনাগাড়ে আউড়ে যেতে শুরু করেছে। নীরবে তার কথা শুনে গেলেন সেটিওয়েইয়ো, তারপর প্রত্যুত্তরে খুব সংক্ষেপে আবার মনে করিয়ে দিলেন, নির্দিষ্ট দিনে নানিয়া হাজির না হলে সে এবং তার বাবা নিঃসন্দেহে যথাসময়ে তাদের বাড়ির কাছেই কোন চৌরাস্তার শোভাবর্ধন করবে।

সেনাপতি নাহুনের চেহারাটা একটু বিশেষরকম দর্শনীয় হলো। সর্বনাশা কথাগুলো রাজার ঠোঁট দিয়ে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে চরম বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো তার মুখে, পরমুহূর্তে বিস্ময়ের বদলে সেখানে দেখা দিলো প্রচণ্ড ক্রোধের ছাপ – হঠাৎ করে অবর্ণনীয় অন্যায়ের শিকার হলে যেমন ক্রোধের উদ্রেক হওয়া খুব স্বাভাবিক। তার সমস্ত দেহ কেঁপে উঠলো থরথর করে, গলা আর কপালের ধমনীগুলো গিঁটবদ্ধ হয়ে ফুলে উঠলো। ঝট্ করে বন্ধ হয়ে গেল হাতের আঙুলগুলো, যেন বর্শার হাতল চেপে ধরেছে শক্ত মুঠিতে। কিন্তু অচিরেই ক্রোধও মিলিয়ে গেল – কারণ একজন জুলু স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আক্রোশপোষণ আর নিয়তির বিরুদ্ধে আক্রোশপোষণ একই কথা – চেহারায় ফুটে উঠলো গভীর হতাশা আর যন্ত্রণা। দৃপ্ত কালো চোখদুটো নিষ্প্রভ হয়ে এলো, তামাটে রঙের মুখখানা নুয়ে পড়লো পাংশুবর্ণ হয়ে। ঠোঁটের দু'পাশ ঝুলে পড়েছে, মৌন বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টায় ঠোঁট কামড়ে ধরায় মুখের এককোণ দিয়ে গড়িয়ে নেমে এসেছে সরু একটা রক্তের রেখা।

হাত তুলে রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে উঠে দাঁড়ালো বিশালদেহী লোকটা। তারপর ঠিক হেঁটে নয়, বলা যায় টলতে টলতে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল সে।

ফটকের কাছে গিয়ে পৌঁছুতেই সেটিওয়েইয়ো তাকে থামতে নির্দেশ দিলেন।

'দাঁড়াও,' বলে উঠলেন রাজা, 'তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি আমি, নাহুন, তোমার মাথা থেকে এসব বউটউ আর বিয়ের ভাবনা দূর করার ব্যবস্থা করছি। এই যে এখানে এই শাদা মানুষটাকে দেখছো, সে আমার অতিথি –

জঙ্গলে গিয়ে মোষ আর অন্যসব বড়ো জানোয়ার শিকার করতে চায়। তার ভার আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সঙ্গে লোকজন নিয়ে যাও, দেখবে তার যেন কোন ক্ষতি না হয়। এক মাসের মধ্যে আবার আমার সামনে হাজির করবে তাকে, নইলে জীবন দিয়ে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। নতুন চাঁদের প্রথম সপ্তাহে – যখন নানিয়া আসবে – সে যেন এখানে আমার ক্রালে উপস্থিত থাকে। মেয়েটাকে যে তুমি সুন্দরী বললে, সে-ব্যাপারে আমি একমত কিনা সেটা তখনই তোমাকে জানাবো। এখন যাও, বাছা। আর তুমি, শাদা মানুষ, তুমিও যাও, যারা সঙ্গে যাবে তারা ভোরবেলা তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। যাত্রা শুভ হোক – তবে মনে রেখো, নতুন চাঁদে দেখা হচ্ছে আবার, তখন আমরা ঠিক করবো আমার বন্দুকরক্ষক হিসাবে তুমি কতো বেতন পাবে। আমার অবাধ্য হয়ো না, শাদা মানুষ, তা না হলে তোমাকে খুঁজতে লোক পাঠাবো – আর আমার দূতদের মতিগতি মাঝেমধ্যে কিন্তু বেশ খারাপ হয়ে থাকে।'

'তার মানে, আমি একজন বন্দী,' ভাবলো হ্যাডেন, 'কিন্তু কোনভাবে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবার ব্যবস্থা না করতে পারলে সমস্যা হবে। যুদ্ধ যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে এ-দেশে আমি থাকতে চাই না – চাই না আমাকে পিষে *মউতি* (ওষুধ) বানানো হোক, কিংবা আমার চোখ উপড়ে ফেলা হোক, অথবা এ-ধরনের আর কোন তামাশা হোক।'

* * *

দশ দিন পার হয়ে গেছে। এক সন্ধ্যায় হ্যাডেন ও তার সঙ্গের লোকজন রক্ত নদী আর উন্‌ভুন্‌ইয়ানা নদীর মাঝামাঝি পার্বত্য প্রদেশের এক অরণ্যময় অঞ্চলে তাঁবু খাটিয়েছে। 'প্লেস অভ দ্য লিট্‌ল্ হ্যান্ড' নামে পরিচিত যে-জায়গাটা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেটার স্থানীয় নাম 'ইসান্দহোয়ানা' পরিচয়ে জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠবে, সেখান থেকে এই অরণ্যসঙ্কুল জায়গাটার দূরত্ব আট মাইলের বেশি হবে না। গত তিন দিন ধরে তারা ছোট একপাল মোষের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে চলেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেগুলোর নাগাল ধরতে পারেনি। জুলু শিকারীরা বলেছে, এর চেয়ে বরং উন্‌ভুন্‌ইয়ানা নদীর ভাটির পথে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলে ভালো হয়, সেখানে অনেক শিকার মিলবে।

কিন্তু পরামর্শটার প্রতি হ্যাডেন কিংবা সেনাপতি নাহুন, কারও আগ্রহ দেখা যায়নি – কী কারণে, সেটা দু'জনই গোপন রেখেছে। হ্যাডেনের উদ্দেশ্য হলো ধীরে ধীরে বাফেলো নদীর দিকে অগ্রসর হওয়া – নদী পেরিয়ে নাটালে সরে পড়ার একটা উপায় সে করতে পারবে বলে আশা করছে। আর নাহুনের ইচ্ছে, ঘুরেফিরে উমগোনার ক্রালের কাছাকাছি অবস্থান বজায় রাখা। এখন তারা যেখানে তাঁবু ফেলেছে সেখান থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়। নাহুনের মনে ক্ষীণ আশা, তার বাগ্‌দত্তা যে-নারীকে আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ছিনিয়ে নিয়ে তুলে দেয়া

হবে রাজার হাতে, সেই নানিয়ার সঙ্গে কথা বলবার কিংবা তাকে অন্তত একটু চোখে দেখার সুযোগ সে হয়তো পাবে।

যেখানে তাঁবু ফেলা হয়েছে তার চেয়ে গা-ছম্‌ছমে ভূতুড়ে জায়গা হ্যাডেন আর কখনও দেখেনি। পেছনে বিস্তৃত কিছু এলাকা খানিকটা জলার মতো, আবার তাতে ঝোপজঙ্গলও রয়েছে। মোষের পাল ওখানেই লুকিয়ে আছে সম্ভবত। দূরে রাজসিক একাকিত্বের মহিমা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইসান্দহ্লোয়ানা পর্বত, সামনে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে ঘন অন্ধকার গভীর অরণ্য, তার প্রান্তসীমা বেষ্টন করে আছে খাড়া পাহাড়শ্রেণী। একটা নদী বয়ে চলে গেছে বনের ভেতর, জলাভূমির পানি ওই নদীতে গিয়ে পড়ে। সমতলভূমির ওপর দিয়ে নদীটা বেশ শান্তভাবেই বয়ে গেছে। কিন্তু সেটার গতিপথের সবটা সমতল নয় – তাঁবু থেকে শ' তিনেক গজ দূরে আচমকা একটা খাড়া গিরিচূড়ার ওপর থেকে ঝুপ্ করে নিচে গড়িয়ে পড়েছে নদীটা। গিরিচূড়ার উচ্চতা এমন কিছু ভয়ানক নয়, কিন্তু খুব খাড়া সেটা। সেখান থেকে নদীর জলধারা প্রবল বেগে আছড়ে পড়েছে নিচের এক প্রস্তরবেষ্টিত বিক্ষুব্ধ জলাশয়ের মধ্যে – সূর্যের আলো সেখানে কখনও পৌঁছুতে পারে বলে মনে হয় না।

'ওই বনের নাম কী, নাহুন?' হ্যাডেন জানতে চাইলো।

'*এমাগুড়ু*, যার মানে হচ্ছে প্রেতনিবাস,' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলো জুলু সেনাপতি – সে তাকিয়ে আছে নানিয়াদের ক্রালের দিকে, ডানদিকের শৈলশিরা বরাবর হেঁটে গেলে সেটা এখান থেকে এক ঘণ্টার পথ।

'প্রেতনিবাস! কেন?'

'কারণ মৃতদের বাস ওখানে – যাদের আমরা বলি *এসেমকোফু*, অর্থাৎ বাক্‌হারা। তাদের সঙ্গে অন্য প্রেতের দলও আছে – *আমাহ্লোসি* বলা হয় যাদের, প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার পরও যারা বেঁচে থাকে।'

'বটে,' বললো হ্যাডেন, 'তা এসব ভূতপ্রেত তুমি কখনও দেখেছো?'

'আমি কি উন্মাদ যে তাদের খুঁজে দেখতে যাবো, শাদা মানুষ? মৃতেরাই শুধু ঢোকে ওই জঙ্গলে, আমাদের লোকজন শুধু জঙ্গলের কিনারায় মৃতদের জন্যে ভোগ রেখে আসে।'

হ্যাডেন হাঁটতে হাঁটতে গিরিচূড়ার কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো, নাহুনও গেল তার পিছু পিছু। সামনে উঁকি দিলো হ্যাডেন। বাঁ-দিকে ভয়ঙ্করদর্শন গভীর জলাশয়, আর তার একেবারে পাড়েই বনের প্রান্ত ও গিরিচূড়ার মাঝখানে সঙ্কীর্ণ এক টুকরো ঘাসে-ঢাকা জমির ওপর একটা কুঁড়েঘর।

'কে থাকে ওখানে?' হ্যাডেন জিজ্ঞেস করলো।

'মহাশক্তিমতী *ইসানুসি* – যাকে বলা হয় *ইন্‌ইয়াংগা* বা ওঝা। *ইন্‌ইয়োসি* (মৌমাছি) বলে ডাকে সবাই তাকে, কারণ ওই বনের ভেতরে জড়ো হওয়া মৃতদের কাছ থেকে সে জ্ঞান সংগ্রহ করে।'

'মোষ শিকার করতে পারবো কিনা আমি সেটা বলতে পারার মতো যথেষ্ট জ্ঞান সে সঞ্চয় করতে পেরেছে বলে কি মনে হয়, নাহুন?'

'তা হয়তো পেরেছে, শাদা মানুষ, কিন্তু –' একটু মুখ টিপে হেসে নাহুন যোগ করলো, 'মৌমাছির চাকে যারা হাজির হয় তারা কিছু না-ও শুনতে পেতে পারে, আবার যতোটা চায় তার বেশিও তাদের শুনতে হতে পারে। ওই মৌমাছির কথায় হুলের খোঁচা আছে।'

'বেশ, দেখি ও আমাকে হুল ফোটাতে পারে কিনা।'

'ঠিক আছে, চলো,' বললো নাহুন। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হ্যাডেনকে নিয়ে গিরিচূড়ার কিনারা ধরে এগিয়ে চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে দাঁড়ালো পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে নেমে যাওয়া একটা স্বতঃসৃষ্ট পথের মাথায়।

পথ বেয়ে নিচে নেমে গেল দু'জন। উতরাইয়ের গোড়ায় ঘাসে-ছাওয়া জমিতে পৌঁছে হেঁটে এগিয়ে গেল কুঁড়েঘরের দিকে। সেটার চারদিকে নলখাগড়ার নিচু বেড়া। ভেতরে ছোট একটা আঙিনা, উইঢিপির মাটি শক্ত করে পিটিয়ে বসিয়ে মসৃণ করে লেপে দেয়া।

এই আঙিনাতেই বসে আছে মৌমাছি। গোলাকার যে ফোকরটা কুটিরের দরজার কাজ করছে তার প্রায় মুখেই পাতা রয়েছে তার চৌকি।

আধো-অন্ধকারে গুড়ি মেরে বসে থাকা মূর্তিটার দিকে দৃষ্টিপাত করে হ্যাডেন প্রথমে যা দেখতে পেলো তা হচ্ছে, মার্জারচর্মের তেলচিটে জীর্ণ কারোসে মোড়া জবুথবু একটা অবয়ব। কারোসের প্রান্তের ঠিক ওপরেই উঁকি দিচ্ছে দুটো চোখ, চিতাবাঘের চোখের মতো হিংস্র এবং ক্ষিপ্র। বুড়ির পায়ের কাছে ছোট একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, সেটাকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো রয়েছে কতকগুলো মানুষের খুলি – জোড়ায় জোড়ায় বসিয়ে রাখা হয়েছে সেগুলো, যেন তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। এ ছাড়া আরও অন্যান্য হাড়গোড় কুটির এবং আঙিনার বেড়ার এখানে-সেখানে শোভা পাচ্ছে – দেখে মনে হয় সেগুলোও মানুষেরই হবে।

'বুড়ি দেখছি দস্তুরমতো সব সম্পত্তি সাজিয়ে বসেছে, মনে মনে ভাবলো হ্যাডেন, কিন্তু মুখে কিছুই বললো না।

ওঝা বুড়িও কিছু বললো না; শুধু তার চকচকে খুদে দু'চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলো হ্যাডেনের মুখের ওপর। হ্যাডেনও প্রীতিজ্ঞাপনের একই উপায় অবলম্বন করলো, সর্বশক্তি দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো বুড়ির দিকে।

হঠাৎ একসময় হ্যাডেন বুঝতে পারলো, এই অদ্ভুত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে পরাভূত হয়ে গেছে। মাথার ভেতরটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে এসেছে – কল্পনায় তার মনে হচ্ছে, সামনে বসে থাকা মেয়েলোকটা যেন একটা অতিকায় ভয়াল মাকড়সায় রূপান্তরিত হয়েছে, নিজের ফাঁদের মুখে বসে রয়েছে সেটা, হাড়গোড়গুলো যেন তার বিভিন্ন শিকারের সংরক্ষিত নিদর্শন।

'কথা বলছো না কেন, শাদা মানুষ?' শেষ পর্যন্ত ধীর স্পষ্ট স্বরে বুড়ি বলে উঠলো। 'অবশ্য তার দরকারও নেই, কারণ তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি। তুমি ভাবছো, আমাকে মৌমাছি না বলে মাকড়সা বলে ডাকলেই বেশি মানানসই হতো। ভয় নেই, এই মানুষগুলোকে আমি মারিনি। এতো মড়া থাকতে আমি মারতে যাবো কী লাভের আশায়? আমি শুধু নিই মানুষের আত্মা, তাদের দেহ নয়, শাদা মানুষ। তাদের জীবন্ত হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে আমি ভালোবাসি, কারণ অনেককিছু পাঠ করতে পারি সেখানে, তাতে আমার জ্ঞান বাড়ে। এখন বলো; শাদা মানুষ, মৃত্যুর বাগানে ব্যস্ত এই মৌমাছির কাছে কী চাও তুমি? আর জম্‌বার পুত্র, তুমিই বা কেন এসেছো এখানে? উমসিট্‌য়্যু বাহিনী যখন মহাযুদ্ধের জন্যে, শাদা আর কালোদের শেষ যুদ্ধের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করছে, তখন কেন তাদের সঙ্গে নেই তুমি? আর যুদ্ধে যদি তোমার রুচি না-ই থাকে তাহলে কেন তুমি সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী নানিয়ার পাশে নেই?'

নাহুন কোন উত্তর দিলো না।

'সামান্য একটা ব্যাপারে এসেছি আমি, বুড়িমা,' হ্যাডেন বলে উঠলো। জানতে চাইছি, আমি শিকারে সফল হতে পারবো কিনা।'

'শিকারে, শাদা মানুষ? কোন্ শিকারে? পশুশিকার, অর্থশিকার নাকি নারীশিকার? হ্যাঁ, এসবের মধ্যেই নিশ্চয় হবে একটা, কারণ শিকারে তোমাকে সবসময় লিপ্ত থাকতেই হবে। সেটাই তোমার স্বভাব – শিকার করা এবং শিকার হওয়া। বলো দেখি, ওই যে মাবুন (বোয়ার্স) শহরের যে ব্যবসায়ী তোমার ছুরির স্বাদ নিয়েছিল, তার জখমের কী অবস্থা? উত্তর দেবার দরকার নেই, শাদা মানুষ। কিন্তু সর্দার, এই গরিব ওঝা বুড়িকে কী দেবে তুমি তার শ্রমের বিনিময়ে?' নাকী সুরে টেনে টেনে কথাগুলো বললো মৌমাছি। 'একজন বৃদ্ধাকে নিশ্চয় তুমি বিনা মজুরিতে খাটাতে চাও না?'

'তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই, বুড়িমা, আমি চলে যাচ্ছি,' বললো হ্যাডেন। মৌমাছির পর্যবেক্ষণক্ষমতা আর মনের কথা বুঝে নেয়ার শক্তির নমুনা দেখে নিজের কৌতূহল মিটে গেছে বলে মনে হতে শুরু করেছে তার।

'উঁহু,' বাঁকা হাসি হেসে বললো মৌমাছি, 'প্রশ্ন করে তার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করবে না, এ কেমন কথা? এখন আমি তোমার কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক নেবো না, শাদা মানুষ; আবার যখন আমাদের দেখা হবে তখন আমার পাওনা মিটিয়ে দিয়ো,' বলে আবারও হেসে উঠলো সে। 'দেখি তোমার মুখটা, তোমার মুখটা আমাকে দেখতে দাও,' বলতে বলতে সে উঠে হ্যাডেনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

আচমকা শীতল কিছু একটার স্পর্শ অনুভব করলো হ্যাডেন তার ঘাড়ে। পরমুহূর্তে এক লাফে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল মৌমাছি। তার বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে ধরা রয়েছে হ্যাডেনের মাথা থেকে কেটে নেয়া একগুচ্ছ কোঁকড়া কালো চুল। এতো দ্রুত ঘটে গেল ব্যাপারটা যে বাধা দেবার সময় পেলো

না হ্যাডেন, বিরক্তি প্রকাশেরও অবকাশ পেলো না। নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে বোকার মতো চেয়ে রইলো শুধু।

'এটুকুই শুধু আমার দরকার,' বলে উঠলো মৌমাছি, 'কারণ আমার হৃদয়ের মতো আমার জাদুবিদ্যাও স্বচ্ছ। দাঁড়াও, জম্‌বার পুত্র, তোমার ক'টা চুলও দাও আমাকে – মৌমাছির কাছে যারা আসবে তাদের সবাইকে তার গুন্‌গুন্‌ শুনতে হবে।'

নির্দেশ মান্য করলো নাহুন, অ্যাসেগাইয়ের ফলার ধারালো প্রান্ত দিয়ে ছোট একগোছা চুল নিজের মাথা থেকে কেটে দিলো। তবে বেশ বোঝা গেল, স্বেচ্ছায় কাজটা করলো না সে, আপত্তি করার সাহস পেলো না বলে করলো।

এবার গা থেকে কারোস খুলে ফেললো মৌমাছি। ওদের সামনে অগ্নিকুণ্ডের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালো। কোমরে বাঁধা একটা থলি থেকে কিছু গাছগাছড়া বের করে ছুঁড়ে দিলো আগুনের মধ্যে।

এখনও বেশ সুগঠিত তার দেহ, আর ওঝাদের যেসব বিশ্রী টুকিটাকি জিনিস শরীরে ধারণ করতে এ-যাবত দেখে এসেছে হ্যাডেন, সেসবের কিছুই মৌমাছির শরীরে নেই। তবে তার গলা বেষ্টন করে আছে অদ্ভুত এক অলঙ্কার – একটা ছোট্ট জ্যান্ত সাপ, লাল আর ধূসর সেটার রঙ। আগন্তুকরা চিনতে পারলো, এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বিষধর সাপগুলোর একটা হচ্ছে এই সাপ। এভাবে সাপ দিয়ে সাজা বান্টু ওঝাদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয় – অবশ্য প্রথমে এসব সাপের বিষদাঁত ভেঙে নেয়া হয় কিনা তা কেউ জানে বলে মনে হয় না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনে ফেলা গাছগাছড়া জ্বলতে শুরু করলো। সেগুলো থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগলো সরু একটা সরল ধারায়। ধোঁয়ার রেখা মৌমাছির মুখে বাধা পেয়ে তার মাথা ঘিরে ফেলে যেন এক আশ্চর্য নীল ঘোমটার মতো ঝুলে রইলো।

হঠাৎ সামনে দু'হাত বাড়িয়ে চুলের গোছাদুটো জ্বলন্ত গাছগাছড়ার ওপর ফেলে দিলো সে। সেগুলো জ্যান্ত জিনিসের মতো মোচড় খেতে খেতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। হাঁ করলো মৌমাছি, বড়ো বড়ো ঢোক গেলার মতো করে চুল আর গাছগাছড়ার ধোঁয়া ফুসফুসে টেনে নিতে শুরু করলো। ওদিকে সাপটা ওষুধের প্রভাব টের পেয়ে ফোঁসফোঁস শব্দ করতে করতে মৌমাছির গলা থেকে পাক খুলে ওপরদিকে বেয়ে উঠে তার মাথার সাজের কালো *সাকাবুলা* পালকের গুচ্ছের ভেতর আশ্রয় নিলো।

অচিরেই ধোঁয়ার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। বিড়বিড় করতে করতে মৌমাছি সামনে-পেছনে দুলতে লাগলো, তারপর ঝুপ্‌ করে বসে পড়লো কুঁড়েঘরে হেলান দিয়ে। মাথাটা ঘরের খড়ের সঙ্গে ঠেস দেয়া রইলো। তার মুখ এখন ওপরে আলোর দিকে তোলা। বীভৎস লাগছে সেটা এখন দেখতে। কারণ নীলবর্ণ হয়ে উঠেছে মুখ, খোলা চোখদুটো মৃত মানুষের চোখের মতো কোটরে বসে গেছে। ওদিকে কপালের ওপরে লাল সাপটা দুলছে আর ফোঁসফোঁস শব্দ করছে – মিশরীয় রাজাদের মূর্তির ভ্রূর ওপরের ইউরেয়াস ক্রেস্ট-এর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে হ্যাডেনের।

দশ সেকেণ্ড কিংবা তারও বেশি সময় ওভাবে বসে রইলো মৌমাছি। তারপর ফাঁপা, অপ্রাকৃত গলায় কথা বলে উঠলো:

'হে কৃষ্ণবর্ণ হৃদয় আর শুভ্রসুন্দর দেহ, তোমার হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করছি। রক্তের মতো কৃষ্ণবর্ণ সে-হৃদয়, সে-হৃদয় রক্তেই কালিমালিপ্ত হবে। কৃষ্ণবর্ণ হৃদয়ের শুভ্রসুন্দর দেহ, শিকার খুঁজে পাবে তুমি, শিকারে সফল হবে। শিকারের পিছু নিয়ে তুমি গিয়ে পৌঁছুবে গৃহহীনদের আবাসে, প্রেতনিবাসে। শিকার আকার নেবে ষণ্ডের, আকার নেবে ব্যাঘ্রের, আকার নেবে নারীর – রাজা কিংবা জলস্রোত যে-নারীর ক্ষতিসাধনে অক্ষম। শুভ্রসুন্দর দেহ আর কৃষ্ণবর্ণ হৃদয়, তোমার প্রাপ্য মজুরি তুমি পাবে – অর্থের বিনিময়ে অর্থ, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত। চিত্রক মার্জার যখন তোমার বুকের উপর গর্জন করতে থাকবে তখন আমার এ-ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ ক'রো; যখন যুদ্ধে প্রকম্পিত হতে থাকবে তোমার চতুর্দিক তখন আমার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ ক'রো; আমার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে ক'রো যখন তোমার মহাপুরস্কার আঁকড়ে ধরবে এবং প্রেতনিবাসে প্রেতাত্মার মুখোমুখি দাঁড়াবে শেষবারের মতো।

'হে শুভ্র হৃদয় আর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, তোমার হৃদয়ের দিকে আমি দৃষ্টিপাত করছি। সে-হৃদয় দুগ্ধের মতো শুভ্র, সারল্যের দুগ্ধ সে হৃদয়কে রক্ষা করবে। নির্বোধ, কেন আঘাত হানতে চাও? ব্যাঘ্রের ভালোবাসা পেতে দাও ওকে, ব্যাঘ্রেরই মতো ওর নিজের ভালোবাসাও। ওকি, ও কার মুখ দেখি যুদ্ধক্ষেত্রে? পিছু নাও, পিছু নাও, দ্রুতচারী – তবে সাবধানে যেয়ো, কারণ যে-জিহ্বা মিথ্যা বলেছে সে-জিহ্বা কখনও করুণার কথা উচ্চারণ করবে না; আর যে-হাত বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, যুদ্ধে সে-হাত বলশালী। শুভ্র হৃদয়, মৃত্যু কী? মৃত্যুতেই জীবনের অধিবাস, আর মৃতদের মধ্যেই তুমি খুঁজে পাবে তোমার হারানো জীবন, কারণ সেখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে সেই নারী যার ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা নেই রাজার কিংবা জলস্রোতের।'

কথা বলছে মৌমাছি, সেইসঙ্গে তার গলার স্বর ক্রমশ নিচু হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত তার কথা প্রায় শ্রুতির অগোচর হয়ে উঠলো। তারপর একবারেই থেমে গেল তার কণ্ঠ। মনে হচ্ছে, ঘোরের ভেতরে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়েছে মৌমাছি।

হ্যাডেন এতক্ষণ কৌতুক আর বিদ্রূপের হাসি নিয়ে তার কথা শুনছিল। এবার সে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো।

'হাসছো কেন, শাদা মানুষ?' নাহুন ক্রুদ্ধ স্বরে জানতে চাইলো।

'নিজের বোকামির জন্যে হাসছি – ওই মিথ্যুক বুজরুকের অর্থহীন বকুনি শুনে সময় নষ্ট করছি শুধু শুধু।'

'অর্থহীন বকুনি নয় এসব, শাদা মানুষ।'

'তাই নাকি? তাহলে বলো দেখি এসবের অর্থ কী?'

'কী অর্থ তা আমি এখনও বলতে পারছি না, তবে ওর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে একটা মেয়ে আর একটা চিতাবাঘের প্রসঙ্গ কিছু একটা আছে, আর আছে তোমার এবং আমার নিয়তির কথা।'

হ্যাডেন কাঁধ ঝাঁকালো – এসব নিয়ে আর বেশি তর্কবিতর্ক নিরর্থক।

এমন সময় শিউরে ওঠার মতো করে গা-ঝাড়া দিয়ে চোখ মেললো মৌমাছি। লাল সাপটা মাথার সাজের ভেতর থেকে টেনে বের করে গলায় পেঁচিয়ে নিলো। তারপর আবার গায়ে জড়িয়ে নিলো তেলচিটে কারোসটা।

'আমার বিদ্যায় বিশ্বাস হয়েছে, *ইনকুস?*' হ্যাডেনকে প্রশ্ন করলো সে।

'আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, জুলুল্যান্ডের সবচেয়ে ধূর্ত ধোঁকাবাজদের তুমি একজন, বুড়িমা,' হ্যাডেন শীতল গলায় উত্তর দিলো। 'এখন বলো, তোমাকে কী দিতে হবে?'

এ-রকম রূঢ় উক্তিতে মৌমাছি রুষ্ট হলো না, তবে এক কি দুই সেকেণ্ডের জন্যে তার চোখে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি ফুটে উঠলো। আগুনের ধোঁয়ায় সাপটা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তখন ঠিক এমনি দেখাচ্ছিল সেটার চাউনি।

'শাদা হুজুর যদি বলেন আমি ধোঁকাবাজ, তাহলে তাই হবে নিশ্চয়,' মৌমাছি উত্তর দিলো, 'কারণ কে ধোঁকাবাজ সেটা সবার চেয়ে তাঁরই ভালো চিনতে পারার কথা। আমি বলেছি, কোন পারিশ্রমিক চাই না – তবু, তোমার থলি থেকে খানিকটা তামাক দাও।'

হ্যাডেন অ্যান্টিলোপ-চামড়ার থলি খুলে খানিকটা তামাক বের করে মৌমাছিকে দিলো। নিতে গিয়ে চট্ করে তার হাত আঁকড়ে ধরলো মৌমাছি, মধ্যম আঙুলে পরা সোনার আংটিটা খুঁটিয়ে দেখলো। সাপের আকৃতিতে তৈরী আংটিটা। সাপের মাথায় বসানো দুটো ছোট পদ্মরাগমণি হলো সেটার দুটো চোখ।

'আমি একটা সাপ পরি আমার গলায়, আর তুমি একটা সাপ পরো তোমার হাতে, ইনকুস। এই আংটিটা পেলে আমি হাতে পরতে পারতাম, তাহলে হয়তো আমার গলার সাপটার একটু কম একা লাগতো।'

'তাহলে যে আমার মৃত্যু পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে!' হ্যাডেন বললো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' হৃষ্ট স্বরে জবাব দিলো মৌমাছি, 'বেশ কথা। তোমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করবো আমি, তারপর আংটিটা নিয়ে নেবো। তাহলে আর কেউ বলতেও পারবে না যে ওটা আমি চুরি করেছি, কারণ নাহুন তখন সাক্ষ্য দেবে যে তুমি আমাকে আংটিটা নিতে অনুমতি দিয়েছিলে।'

প্রথমবারের মতো চমকে উঠলো হ্যাডেন। মৌমাছির গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা হঠাৎ তাকে সাংঘাতিক নাড়া দিয়ে গেছে। যদি নিজের পেশাদারী ভঙ্গিতে কথাগুলো বলতো বুড়ি, তাহলে হ্যাডেনের মনে কোন প্রতিক্রিয়াই হতো না। কিন্তু লোলুপতা প্রকাশ করতে গিয়ে অকৃত্রিম হয়ে উঠেছে মৌমাছি, এবং স্পষ্ট বোঝা গেছে, সে কথা বলছে স্থির প্রত্যয় থেকে, নিজের কথায় বিশ্বাস রেখে।

হ্যাডেনকে চমকে উঠতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর বদলে ফেললো মৌমাছি।

'শাদা হুজুর এই বেচারা বুড়ি ওঝার তামাশা ক্ষমা করে দেবেন আশা করি,' নাকী সুরে টেনে টেনে বললো সে। 'মৃত্যু নিয়ে এতো কারবার আমার যে যখন-তখন শব্দটা মুখে এসে পড়ে,' বলে সে প্রথমে তার চারপাশের মড়ার খুলির বেষ্টনীর ওপর চোখ বোলালো, তারপর যে-জলপ্রপাত থেকে নিচের অন্ধকার জলাশয়ের ভেতর পানি ঝরে পড়ছে সেটার দিকে চোখ তুলে তাকালো।

'ওই দেখো,' বললো সে ছোট্ট করে।

সামনে বাড়ানো তার হাত বরাবর তাকিয়ে হ্যাডেনের দৃষ্টি পড়লো দুটো শুকিয়ে যাওয়া মিমোজা গাছের ওপর। জলপ্রপাতের পাথুরে কিনারার ওপর প্রায় সমকোণে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে গাছদুটো। কয়েকটা কাঠের গুঁড়ি চামড়ার ফালি দিয়ে গাছদুটোর সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে একটা পাটাতনের মতো তৈরি করা হয়েছে। সেই পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তিনটি মনুষ্যমূর্তি: দূরত্ব এবং জলপ্রপাতের পানির ছিটা সত্ত্বেও হ্যাডেন বুঝতে পারলো তাদের দু'জন পুরুষ, একজন মেয়ে – অস্তগামী সূর্যের আভায় আগুনের মতো লাল হয়ে ওঠা আকাশের পটভূমিতে তাদের আকৃতি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এই দেখা গেল তিনজন দাঁড়িয়ে আছে, পরমুহূর্তে দেখা গেল দু'জন – মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কালোমতো কিছু একটা জলপ্রপাতের ধারা বরাবর তীব্র বেগে গড়িয়ে নেমে জলাশয়ের পানির উপর ভারী শব্দে আছড়ে পড়লো, সেইসঙ্গে হ্যাডেনের কানে ভেসে এলো ক্ষীণ একটা আর্তচিৎকার।

'কী মানে ওসবের?' আতঙ্কিত বিস্মিত হ্যাডেন জিজ্ঞেস করলো।

'কিছুই না,' হেসে বললো মৌমাছি। 'তুমি তাহলে জানো না দেখছি – বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীলোক যারা, কিংবা রাজার অনুমতি ছাড়া ভালোবাসায় লিপ্ত হয় যেসব মেয়ে, তাদের আর তাদের সহযোগীদের এখানেই নিয়ে আসা হয় মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে। ওহ্! এভাবে প্রতিদিন এখানে জীবন দেয় ওরা – আমি ওদের মরতে দেখি আর হিসেব রাখি,' বলতে বলতে কুটিরের ছাউনি থেকে একটা দাগ-কাটা কাঠি টেনে বের করলো সে, তারপর একটা ছুরি নিয়ে কাঠির ওপরের অসংখ্য খাঁজের সঙ্গে আরও একটা খাঁজ যোগ করলো। নাহুনের দিকে তাকাচ্ছে বারবার – চোখে খানিকটা প্রশ্নের আভাস, খানিকটা বিপদসঙ্কেত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মৃত্যুর মুল্লুক এটা,' বিড়বিড় করে বললো সে। 'ওই ওখানে ওপরে জীবিতেরা দিনের পর দিন মরতে থাকে, আর নিচে –' হাত তুলে জলাশয়ের ওপারে নদীর গতিপথ দেখিয়ে কুটির থেকে শ' দুয়েক গজ দূরে যেখানে বন শুরু হয়েছে সেখানে আঙুল নির্দেশ করলো মৌমাছি, 'ওখানে তাদের আত্মা আশ্রয় নেয়। – ওই শোনো!'

তার কথার সঙ্গেই একটা আওয়াজ ভেসে এলো ওদের কানে – জঙ্গলের ধূসর প্রান্তরেখা থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠলো যেন শব্দটা। বিদঘুটে অশুভ সেই আওয়াজের নিখুঁত বর্ণনা দেয়া অসম্ভব, বড়জোর বলা যেতে পারে, প্রায় অস্ফুট এক ধরনের জান্তব চিৎকার যেন সেটা।

'ওই শোনো,' আবার বলে উঠলো মৌমাছি, 'খুশি হয়ে উঠেছে ওরা ওখানে।'

'কারা?' হ্যাডেন প্রশ্ন করলো, 'বেবুনের দল?'

'না, ইনকুস, ওরা হচ্ছে *আমাটোংগো* – প্রেতাত্মার দল, এইমাত্র যে-মেয়েটা তাদের একজন হয়ে গেল তাকে স্বাগত জানাচ্ছে।'

'প্রেতাত্মা,' কর্কশ স্বরে বললো হ্যাডেন – নিজের কাঁপুনির জন্যে রাগ হচ্ছে তার, 'ওই প্রেতাত্মাদের আমি দেখতে চাই। জঙ্গলের ভেতর বানরের পালের চিৎকার কি আগে কখনও আমি শুনিনি ভেবেছো, বুড়িমা? এসো, নাহুন, পাহাড় বেয়ে ওঠার মতো আলো থাকতে থাকতে রওনা হওয়া যাক চলো। বিদায়।'

'বিদায়, ইনকুস। ভাবনা ক'রো না, তোমার ইচ্ছে পূরণ হবে। নিরাপদে চলে যাও, ইনকুস, শান্তিতে ঘুমোও গিয়ে।'

তিন

সুনিদ্রার জন্য মৌমাছির আশীর্বচন সত্ত্বেও ফিলিপ হ্যাডেনের ভালো ঘুম হলো না সে-রাতে। শরীর-স্বাস্থ্য বেশ চমৎকার আছে, বিবেকও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কিছু উৎপাত করেনি, তবু ঘুম তার কিছুতেই এলো না।

যখনই দু'চোখ বন্ধ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে অদ্ভুত নামধারী সেই বুড়ি ওঝা মৌমাছি-র করাল চেহারা, কানে বাজতে থেকেছে বিকেলে শোনা তার অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী। কুসংস্কারপরায়ণ মানুষ নয় হ্যাডেন, ভিতুও নয়, আর অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস যদি তার মনে কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তবে তা আছে বড়জোর সুপ্ত অবস্থায়। কিন্তু যতই চেষ্টা করুক না কেন, গা-ছমছম-করা একটা ভয়ের অনুভূতি সে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে না – ওই ডাইনির ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ছিটেফোঁটা সত্য যদি কিছু থেকে থাকে! যদি সত্যি মৃত্যু আসন্ন হয়ে থাকে তার, বুকের ভেতর প্রবল শক্তিতে স্পন্দিত হচ্ছে যে হৃদ্‌যন্ত্র তা যদি অচিরেই চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়!

না, এসব ভাববে না সে। এই থমথমে জায়গা আর সন্ধ্যায় দেখা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার মনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এই জুলুদের স্থানীয় রীতিনীতি সুবিধার নয় – এ-দেশ থেকে পালাবার সুযোগ পাওয়ামাত্র সে এদের নাগালের বাইরে চলে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছে।

সত্যি বলতে কি, যদি কোন উপায় করতে পারে তাহলে আগামীকাল রাতেই সীমান্তের দিকে ছুট দেবার ইচ্ছে তার। অবশ্য সফল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা সামনে রেখে কাজটা করতে হলে তাকে একটা মোষ বা অন্য কোন জানোয়ার শিকার করতে হবে। বেশ জানে, তাহলে তার সঙ্গের শিকারীরা মাংস দিয়ে এমন ভূরিভোজন করবে যে তাদের আর নড়াচড়ার শক্তি থাকবে না। আর সেটাই হবে তার সুযোগ।

অবশ্য নাহুন এই প্রলোভনের ফাঁদে পা না-ও দিতে পারে। কাজেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে হ্যাডেনকে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। চূড়ান্ত রকমের সমস্যা দেখা দিলে তার দেহে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারবে হ্যাডেন – সেটা তার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে বলেই সে মনে করে, কারণ, দেখা যাচ্ছে সত্যিকার অর্থে লোকটার হাতে সে বন্দী হয়ে আছে। সন্দেহ নেই, প্রয়োজন দেখা দিলে অহেতুক দ্বিধা-সংশয় বাদ দিয়ে এভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা সে করতে পারবে। কারণ, নাহুনকে আদতে অপছন্দ করে সে, এমনকি মাঝে মাঝে ঘৃণা পর্যন্ত করে। তাদের দু'জনের প্রকৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ। সে জানে, বিশালদেহী ওই জুলু তাকে অবিশ্বাস করে, তাকে অবজ্ঞার চোখে

দেখে। আর, জংলী এক 'নিগার' অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলে সেটা হ্যাডেনের মতো দাম্ভিক মানুষের পক্ষে হজম করা একটু বেশিই শক্ত।

ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই হ্যাডেন উঠে পড়লো। তার সঙ্গীরা তখনও সবাই নিবে-আসা আগুনের চারপাশে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে, প্রত্যেকের শরীর কারোস কিংবা কম্বলে মোড়া। তাদের ডেকে তুললো হ্যাডেন। নাহুন উঠে দাঁড়িয়ে গা-ঝাড়া দিলো। ভোরের আলো-আঁধারিতে প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে তাকে।

'ইচ্ছেটা কী তোমার, *উমলুংগু* (শাদা মানুষ) – সূর্য না উঠতেই উঠে পড়লে?'

'আমার ইচ্ছে, *মুনটুমপোফু* (হলদে মানুষ), মোষ শিকার করা,' শীতল গলায় জবাব দিলো হ্যাডেন। জংলীটা তাকে সম্মানসূচক কোন সম্বোধন করে না বলে ক্ষুব্ধ সে।

'মাফ ক'রো,' তার মনের ভাব বুঝতে পেরে জুলু বলে উঠলো, 'কিন্তু তোমাকে *ইনকুস* বলে আমি ডাকতে পারি না, কারণ আমার কিংবা অন্য কারও সর্দার নও তুমি। তবু যদি "শাদা মানুষ" কথাটা তোমার শুনতে ভালো না লাগে, একটা নাম আমরা তোমাকে দেবো।'

'তোমাদের যেমন ইচ্ছে,' হ্যাডেন সংক্ষেপে জবাব দিলো।

কথামতো একটা নাম ওরা তাকে দিলো – *ইনহ্লিজিন-ম্গামা*। ওদের মধ্যে এই নামেই তার পরিচিতি হলো এরপর। কিন্তু হ্যাডেন খুব প্রীত বোধ করলো না যখন সে জানতে পেলো, ওই শ্রুতিকোমল শব্দবন্ধের অর্থ হচ্ছে 'কালো মন'। মৌমাছিও এ-নামেই সম্বোধন করেছিল তাকে – কেবল আলাদা প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছিল।

এক ঘণ্টা পর। তাঁবুর পেছনের এলাকায় বিস্তৃত জলাময় জঙ্গলে শিকার খুঁজছে হ্যাডেন ও তার দলবল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হাত উঁচু করলো নাহুন, তারপর মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো। হ্যাডেন তাকিয়ে দেখলো, জলো মাটিতে গভীর হয়ে ফুটে আছে ছোট একপাল মোষের পায়ের ছাপ। দেখে মনে হচ্ছে, দশ মিনিটের বেশি আগের কিছুতেই হবে না।

'জানতাম আজ শিকার মিলবে,' নাহুন ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'মৌমাছি বলেছিল।'

'নিপাত যাক মৌমাছি,' চাপা গলায় উত্তর দিলো হ্যাডেন। 'চলো।'

পনেরো মিনিট কি তারও বেশি সময় ধরে তারা ঘন শরবনের ভেতর দিয়ে পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগোলো। হঠাৎ খুব আস্তে শিস্ দিয়ে উঠলো নাহুন, হ্যাডেনের বাহু স্পর্শ করলো।

মুখ তুলে তাকালো হ্যাডেন। প্রায় দু'শো গজ দূরে উঁচুমতো একটা জায়গায় একগুচ্ছ মিমোজা গাছের মধ্যে দাঁড়িয়ে মোষগুলো ঘাস খাচ্ছে। সব মিলিয়ে ছ'টা – চমৎকার মাথার একটা ধাড়ি ষাঁড়, তিনটে মাদী, একটা বকনা আর একটা মাস চারেক বয়সের বাছুর।

বাতাস কিংবা জঙ্গলের ধরন কোনটাই ওদের বর্তমান অবস্থান থেকে গা-ঢাকা দিয়ে শিকারের কাছে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। কাজেই ঘুরপথে আধ মাইল গিয়ে তারা বাতাসের উজানে খুব সন্তর্পণে গুড়ি মেরে জানোয়ারগুলোর দিকে এগোতে শুরু করলো। মিমোজা গাছের এক গুঁড়ি থেকে আরেক গুঁড়ির আড়ালে দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে একেকজন। সেটা যখন আর সম্ভব রইলো না, তখন লম্বা *টামবুটি* ঘাসের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে হেঁটে এগোলো।

শেষ পর্যন্ত চল্লিশ গজের মধ্যে এসে পড়লো তারা। আর এগোনো ঠিক হবে না মনে হচ্ছে। কারণ, ধাড়ি ষাঁড়টার হাবভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তাদের গন্ধ না পেলেও অস্বাভাবিক কোন আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সেটা, এবং ক্রমেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে।

দলের মধ্যে একমাত্র হ্যাডেনের হাতেই রাইফেল আছে। তার সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে বকনাটা। আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে আছে – ঘায়েল করার পক্ষে চমৎকার। ওটার মাংসই সবচেয়ে সুস্বাদু হবে বিবেচনা করে হ্যাডেন তার মার্টিনি তুললো, জানোয়ারটার কাঁধের ঠিক পেছনে লক্ষ্যস্থির করে আস্তে ট্রিগার টেনে দিলো। গর্জে উঠলো রাইফেল, বকনাটা লুটিয়ে পড়লো, বুলেট সেটার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, অন্য মোষগুলো সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালালো না। তার বদলে সেগুলো যেন আকস্মিক আওয়াজের অর্থ বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, বাতাস থেকে কোনকিছুর গন্ধ উদ্ধার করতে না পেরে মাথা উঁচু করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো।

এই সুযোগে রাইফেলে নতুন একটা গুলি ভরে নিয়ে আবার তাক করলো হ্যাডেন, এবার তার লক্ষ্য ধাড়ি ষাঁড়টা। বুলেট গিয়ে লাগলো সেটার ঘাড় কিংবা কাঁধের কোথাও। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল প্রথমে জন্তুটা, কিন্তু পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়ালো – ধোঁয়ার মেঘ দেখতে পেয়ে সোজা তেড়ে এলো সেদিক লক্ষ্য করে।

ধোঁয়ার জন্যেই হোক, কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, হ্যাডেন সেটাকে আসতে দেখতে পেলো না; ফলে একেবারে নিশ্চিতভাবে মোষের পায়ের নিচে নিষ্পিষ্ট কিংবা শিঙের গুঁতোয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো সে, যদি না নাহুন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে তাকে টান মেরে একটা উইঢিপির পেছনে নিয়ে ফেলতো। মুহূর্তমাত্র পরেই প্রকাণ্ড জানোয়ারটা ঝড়ের বেগে পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল সামনে – তাদের দিকে সেটার আর কোন নজর পড়লো না।

'এগোই চলো,' বলে উঠলো হ্যাডেন। নিহত মোষটাকে কেটেকুটে মাংসের সবচেয়ে ভালো অংশগুলো তাঁবুতে নিয়ে যাবার জন্যে বেশির ভাগ লোককে সেখানে রেখে বাকিদের নিয়ে সে রক্তের দাগ ধরে রওনা হলো।

কয়েক ঘণ্টা ধরে আহত ষাঁড়টাকে অনুসরণ করে এগোলো তারা। শেষ পর্যন্ত ঘন ঝোপজঙ্গলে ছাওয়া একখণ্ড পাথুরে জমিতে এসে পায়ের ছাপ হারিয়ে ফেললো। গরমে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে সবাই। বিশ্রাম নেবার জন্যে সেখানে বসে

পড়লো। সঙ্গে আনা *বিলটং*, অর্থাৎ রোদে-শুকানো মাংসও খানিকটা করে খেয়ে নেবে।

খাওয়া শেষ করে সবাই তাঁবুতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর মধ্যে দলের চারজন জুলুর একজন পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সরু নদীতে পানি খেতে গেল। দশ কদমের বেশি দূর হবে না সেটা। আধ মিনিট পরেই ভয়ঙ্কর একটা ঘোঁত্‌ঘোঁত্‌ আওয়াজ আর পানির ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ ভেসে এলো। সেইসঙ্গে সবাই দেখতে পেলো, ছিটকে শূন্যে উঠে গেছে জুলুটা। যতক্ষণ সবাই বসে বসে খেয়েছে, আহত মোষটা নদীর তীরে ঘন ঝোপের নিচে আত্মগোপন করে অপেক্ষায় থেকেছে। ধূর্ত জানোয়ারটা জানতো, একসময় না একসময় তার সুযোগ আসবেই। আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠে ছুটে গেল সবাই। দেখতে পেলো, চড়াই পেরিয়ে মোষটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেলো না হ্যাডেন। তাদের সঙ্গী মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে, প্রকাণ্ড শিংয়ের গুঁতোয় তার ফুসফুস বিদীর্ণ হয়ে গেছে।

'মোষ নয় ওটা, ওটা শয়তান,' হাঁ করে শ্বাস টানতে চেষ্টা করছে বেচারা। মারা গেল সে।

'শয়তান হোক আর যা-ই হোক, ওটাকে আমি মারবোই,' হ্যাডেন বলে উঠলো। মৃতদেহ তাঁবুতে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অন্যদের রেখে শুধু নাহুনকে সঙ্গে নিয়ে সে আবার রওনা হলো। এখন চারপাশটা আরও খোলামেলা বলে মোষের পিছু ধাওয়া করা আরও সহজ হচ্ছে। জানোয়ারটাকে প্রায়ই চোখে পড়ছে, যদিও গুলি ছোঁড়ার মতো যথেষ্ট কাছে যেতে পারছে না তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জন একটা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে শুরু করলো।

'জানো আমরা এখন কোথায়?' বললো নাহুন। হাত তুলে উল্টোদিকের বনের রেখা দেখালো। 'ওই যে *এমাগুড়ু* – প্রেতনিবাস। আর দেখো, মোষটা ওদিকেই যাচ্ছে।'

হ্যাডেন চারপাশে চোখ বোলালো। ঠিকই বলেছে নাহুন। বাঁ-দিকে দূরে দেখা যাচ্ছে সেই জলপ্রপাত, মৃত্যুগহ্বর, আর মৌমাছির কুটির।

'খুব ভালো কথা,' জবাব দিলো সে, 'আমরাও তাহলে যাবো ওদিকে।'

নাহুন থেমে দাঁড়ালো। 'নিশ্চয় তুমি ওই বনে ঢুকছো না?' বিমূঢ় স্বরে বললো সে।

'নিশ্চয় ঢুকছি,' হ্যাডেন উত্তর দিলো। 'তবে তুমি যদি ভয় পাও, তোমার যাবার দরকার নেই।'

'ভয় আমি পাচ্ছি – প্রেতের ভয়,' নাহুন বললো, 'তবু যাবো আমি।'

ঘাসে-ঢাকা জায়গাটা পার হয়ে গেল দু'জন। তারপর ভূতুড়ে অরণ্যে ঢুকে পড়লো।

জায়গাটার পরিবেশ সত্যি থমথমে। প্রকাণ্ড সব ঝাঁকড়া গাছ গা ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে আছে, আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে পুরোপুরি। তার ওপর বনের নিস্তব্ধ বাতাস পচা ডালপাতার গন্ধে ভারী হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, জীবনের

কোন অস্তিত্ব নেই এখানে, কোন শব্দ নেই – শুধু হঠাৎ হয়তো একটা কদর্য চিতিসাপ কুণ্ডলী ছাড়িয়ে ধীরগতিতে সরে যাচ্ছে, কিংবা ভারী একটা পচা ডাল গাছ থেকে খসে পড়ছে সশব্দে।

হ্যাডেনের সমস্ত মনোযোগ অবশ্য মোষের দিকে, ফলে চারপাশের কোনকিছু তার মনের উপর তেমন একটা ক্রিয়া করছে না। একবার শুধু সে মন্তব্য করলো, এতো অল্প আলোয় লক্ষ্যভেদ করা কঠিন হবে। তারপর আবার এগিয়ে চললো।

জঙ্গল ভেদ করে নিশ্চয় মাইলখানেক কিংবা তারও বেশি গভীরে ঢুকে পড়েছে তারা। এমন সময় দেখা গেল, মোষের পায়ের ছাপের সঙ্গে রক্তের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে গেছে। তার মানে, জানোয়ারটার জখমের অবস্থা মারাত্মক হয়ে উঠেছে।

'জলদি চলো এবার,' হৃষ্ট স্বরে বললো হ্যাডেন।

'না, ধীরে ধীরে সাবধানে এগোও –' নাহুন উত্তর দিলো, 'মারা যাচ্ছে শয়তানটা, কিন্তু মরবার আগে আমাদের ওপর আরেকটা চাল দিতে চেষ্টা করবে।' সন্তর্পণে সামনে নজর রেখে চলতে লাগলো সে।

'সব তো এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে,' মাটির দিকে আঙুল তাক করে বললো হ্যাডেন – ভেজা মাটিতে পায়ের গভীর ছাপ সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে।

নাহুন উত্তর দিলো না, সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কয়েক কদম সামনে ডানদিকে দুটো গাছের গুঁড়ির দিকে। 'ওই দেখো,' ফিস্‌ফিস্ করে বললো সে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো হ্যাডেন। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর গাছদুটোর পেছনে গুড়ি মেরে থাকা বাদামী রঙের একটা আকৃতি তার চোখে ধরা পড়লো।

'মরে গেছে,' বলে উঠলো সে।

'না,' নাহুন উত্তর দিলো। 'নিজের পথ ধরে আবার ফিরে এসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ও জানে, আমরা ওর পায়ের ছাপ ধরে এগোচ্ছি। এখন যদি এই জায়গাটাতে তুমি দাঁড়াও, বোধ হয় গাছের গুঁড়িদুটোর মাঝখান দিয়ে ওটার পিঠে গুলি করতে পারবে।'

হ্যাডেন হাঁটু গেড়ে বসলো। মোষটার শিরদাঁড়ার ঠিক নিচের একটা জায়গা বরাবর খুব সাবধানে লক্ষ্য স্থির করলো। টেনে দিলো ট্রিগার। ভয়াল একটা গর্জন শোনা গেল, পরমুহূর্তে জানোয়ারটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তেড়ে এলো তাদের দিকে। নাহুন তার চওড়া বর্শা শাঁ করে ছুঁড়ে দিলো সামনে, সেটা সোজা গিয়ে গভীরভাবে গেঁথে গেল মোষের বুকের ভেতর। দু'জন ছুট দিলো এঁকেবেঁকে।

মোষটা এক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো – সেটার সামনের দু'পা বাঁকা হয়ে দু'পাশে অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছে, মাথাটা নুয়ে পড়েছে নিচে। প্রথমে

পলায়মান দু'জন মানুষের একজনের দিকে, তারপর অন্যজনের দিকে তাকিয়ে দেখলো জানোয়ারটা। সবশেষে হঠাৎ নিচু একটা গোঙানির শব্দ তুলে গড়িয়ে পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল – পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল নাহুনের অ্যাসেগাই।

'বাস্, খতম!' বলে উঠলো হ্যাডেন। 'তোমার অ্যাসেগাইয়ের ঘায়েই মরেছে মনে হচ্ছে। – সেকি! ও কিসের আওয়াজ?'

নাহুন কান পেতে শুনলো। বনের নানা অঞ্চল থেকে – তবে ঠিক কতো দূর থেকে বলা অসম্ভব – অদ্ভুত একটা শোরগোল ভেসে আসছে, যেন ভয় পেয়ে বহু লোক একে অন্যকে ডাকাডাকি করছে। কিন্তু তাদের ভাষা কোন সুপরিস্ফুট ভাষা নয়। শিউরে উঠলো সে

'এসেমকোফু,' বললো নাহুন। 'ভাষাহীন প্রেতাত্মা ওরা, শুধু বাচ্চাদের মতো চিৎকার করতে পারে। যাই চলো এখান থেকে; জ্যান্ত মানুষদের জন্যে এ-জায়গা খারাপ।'

'মোষেদের জন্যে আরও খারাপ,' মৃত মোষের গায়ে একটা লাথি মেরে বললো হ্যাডেন,'তবু বোধ হয় এটাকে তোমার বন্ধু এসেমকোফুদের জন্যে এখানেই ফেলে যেতে হবে, কারণ মাংস যথেষ্ট আছে আমাদের, আর এটা বয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।'

দু'জন ফিরতি পথ ধরলো জঙ্গল ছেড়ে খোলা জায়গায় বেরোবার জন্যে। বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে পথ করে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, এমন সময় হ্যাডেনের মাথায় নতুন একটা মতলব এলো। এ-বন ছেড়ে বেরোলে জুলু সীমান্ত আর ঘণ্টাখানেকের পথ। আর জুলু সীমান্ত একবার পেরোতে পারলেই তার বর্তমান আপদ চুকে যায়। তার পরিকল্পনা ছিল অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়া, কিন্তু সেটা ঝুঁকির ব্যাপার হবে। সবগুলো জুলুই ভরপেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে এমন কথা নেই, বিশেষ করে যখন তাদের একজন সঙ্গী মারা পড়েছে। নাহুন তো তা করবেই না, দিনরাত হ্যাডেনকে পাহারা দিয়ে রেখেছে সে। এ-ই মোক্ষম সুযোগ – এখন প্রশ্ন থাকছে শুধু নাহুনের।

ঠিক আছে, সমস্যা চরমে ওঠে যদি, নাহুনকে মরতে হবে। কঠিন হবে না কাজটা – গুলিভর্তি রাইফেল আছে হাতে, আর ওদিকে অ্যাসেগাই হারিয়ে নাহুনের এখন আছে শুধু একখানা কেরি। লোকটাকে মারতে চায় না হ্যাডেন, যদিও এটা পরিষ্কার যে, নিজের এই বিপদগ্রস্ত অবস্থায় কাজটা করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হবে। ব্যাপারটা না হয় নাহুনের ওপরই ছেড়ে দেয়া যাক – তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

প্রায় দশ কদম সামনে ছোট একটা খোলা জায়গা পার হচ্ছে নাহুন। তাকে হ্যাডেন খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু সে নিজে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত একটা গাছের ছায়ার নিচে, গাছটার নিচু ডালপালা গুঁড়ি থেকে চারদিকে আড়াআড়ি মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে ছড়িয়ে আছে।

'নাহুন!' ডাক দিলো সে।

নাহুন ঘুরে দাঁড়ালো। এক পা এগিয়ে এলো হ্যাডেনের দিকে।

'উঁহু, ন'ড়ো না। ওখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, নইলে গুলি করতে বাধ্য হবো আমি। এখন শোনো: ভয় পেয়ো না, আমি অকারণে গুলি ছুঁড়বো না। আমি তোমার বন্দী – রাজার সেবার জন্যে আমাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তোমাকে। কিন্তু আমার ধারণা, তোমাদের এবং আমাদের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। আর সেজন্য, বুঝতেই পারছো, সেটিওয়েইয়োর ক্রালে ফিরে যেতে চাই না আমি। কারণ তাহলে হয় সেখানে ভয়ঙ্কর কোন উপায়ে আমার মৃত্যু ঘটবে, আর নয়তো নিজের ভাইয়েরা আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে ধরে নেবে এবং বিশ্বাসঘাতকের যা প্রাপ্য তা-ই করবে আমাকে নিয়ে। জুলু সীমান্ত এখান থেকে এক ঘণ্টার পথের চেয়ে খুব বেশি দূরের পথ হবে না – ধরা যাক দেড় ঘণ্টার পথ; চাঁদ ওঠার আগেই আমি সীমান্ত পার হয়ে যেতে চাই। এখন বলো, নাহুন, তুমি কি আমাকে বনের ভেতর হারিয়ে যেতে দিয়ে এই দেড় ঘণ্টার সময় দেবে – নাকি তোমার ওই প্রেতাত্মার দলের সঙ্গে নিজে এখানে থেকে যাবে? বুঝতে পারছো আমার কথা? না, ন'ড়ো না দয়া করে।'

'বুঝতে পারছি তুমি কী বলছো,' সম্পূর্ণ অবিচল স্বরে জবাব দিলো নাহুন। 'আজ সকালে আমরা তোমাকে বেশ উপযুক্ত নামই দিয়েছি মনে হচ্ছে। তবে, কালো মন, তোমার কথায় কিছুটা যুক্তি আছে, তার চেয়েও বেশি আছে বিচারবুদ্ধি। ভালো একটা সুযোগ রয়েছে তোমার হাতে, তোমার মতো লোকের পক্ষে সে-সুযোগ হারাতে দেয়া উচিত নয়।'

'তুমি ব্যাপারটাকে এভাবে দেখছো বলে খুশি হলাম, নাহুন। এখন দয়া করে আমাকে তোমার চোখের আড়াল হতে দাও, এবং কথা দাও, চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত আমাকে খুঁজবে না।'

'কী বলতে চাইছো তুমি, কালো মন?'

'যা বলছি তা-ই। নাও, নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার হাতে।'

'অদ্ভুত মানুষ তুমি,' চিন্তামগ্নভাবে বললো নাহুন। 'আমাকে রাজা কী আদেশ দিয়েছেন তুমি শুনেছো। তুমি কি চাও রাজার আদেশ অমান্য করি আমি?'

'নিশ্চয়ই চাই। সেটিওয়েইয়োকে ভালোবাসার কোন কারণ নেই তোমার। তাঁর বন্দুক মেরামতের কাজ করার জন্যে তাঁর ক্রালে আমি ফিরি বা না ফিরি তাতেও তোমার কিছু যায় আসে না। যদি ভাবো, আমি পালিয়ে গেছি বলে তিনি রুষ্ট হবেন, তাহলে তুমিও বরং সীমান্ত পার হয়ে চলে যেতে পারো – একসঙ্গে যেতে পারি আমরা।'

'আমার বাবা আর ভাইবন্ধুদের ফেলে রেখে যাবো রাজার প্রতিশোধের মুখে? কালো মন, তুমি বুঝতে পারছো না – পারবেই বা কী করে ওই নামের মানুষ হয়ে? আমি একজন সৈনিক, এবং রাজার আদেশ রাজার আদেশই। ভেবেছিলাম, লড়াই করে জীবন দেবো, কিন্তু তোমার ফাঁসে আটকানো পাখি এখন আমি। নাও, গুলি করো, তা না হলে চাঁদ ওঠার আগে সীমান্তে পৌঁছতে পারবে না,' ব'লে দু'বাহু দু'দিকে ছড়িয়ে দাঁড়ালো নাহুন। মুচকি হাসলো।

'সেটাই যদি অনিবার্য হয়, তা-ই হোক তবে,' শান্ত কণ্ঠে বললো হ্যাডেন। 'বিদায়, নাহুন, সাহসী লোক তুমি অন্তত – তবে নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা তো প্রত্যেককেই করতে হবে।'

অতি ধীরে রাইফেল তুলে নাহুনের বুকের দিকে তাক করলো হ্যাডেন।

তার শিকার অনড় দাঁড়িয়ে আছে। তখনও হাসি লেগে আছে মুখে, তবে কোন মাত্রার সাহসিকতা দিয়েই যা রোধ করা সম্ভব নয়, সেই প্রকৃতিগত আতঙ্ক প্রকাশ হয়ে পড়েছে তার ঠোঁটের বিশেষ এক ধরনের কুঞ্চন থেকে।

হ্যাডেনের আঙুল চেপে বসতে শুরু করেছে ট্রিগারের ওপর। ঠিক এমন সময় চোখের নিমেষে যেন বজ্রের আঘাতে চিৎ হয়ে আছড়ে পড়লো সে মাটিতে। পরমুহূর্তে দেখা গেল, তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে গোল গোল ছোপওয়ালা প্রকাণ্ড একটা জানোয়ার – লম্বা লেজ এদিক-ওদিক নাড়ছে সেটা, জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে হ্যাডেনের চোখের দিকে।

জানোয়ারটা একটা চিতাবাঘ – আফ্রিকায় যাকে বাঘ বলা হয়ে থাকে। ওপরে গাছের একটা ডালে গুড়ি মেরে বসে ছিল, নিচে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে দিয়ে তার বন্য ক্ষুধা মেটাবার লোভ সামলাতে পারেনি। দু'এক মুহূর্তের নীরবতা, চিতাবাঘের গর্‌গর্‌ আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অদ্ভুত ব্যাপার, সামান্য সেই সময়টুকুতে হ্যাডেনের মনের পর্দায় ভেসে উঠলো সেই ওঝা বুড়ির ছবি, যার নাম *ইনইয়োসি* বা মৌমাছি। সে যেন দেখতে পেলো, মৌমাছির বীভৎস মাথাটা ঠেস দেয়া রয়েছে কুঁড়েঘরের খড়ের বেড়ায়, করাল ঠোঁট দিয়ে সে বিড়বিড় করে বলছে,'আমার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ ক'রো যখন চিত্রক মার্জার গর্জন করতে থাকবে তোমার মুখের ওপর...।'

শক্তিপ্রয়োগ করতে শুরু করলো জানোয়ারটা। একটা থাবার ধারালো নখ ঢুকিয়ে দিলো হ্যাডেনের বাম ঊরুর মাংসের গভীরে। অন্য থাবা দিয়ে আঁচড়াতে লাগলো বুক, কাপড় ছিন্নভিন্ন করে নিচের মাংস ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। শাদা চামড়া দেখতে পেয়ে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলো সেটা, রক্তের হিংস্র নেশায় চৌকো চোয়াল নামিয়ে এনে তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলো শিকারের কাঁধ।

পরমুহূর্তে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মুগুরের সজোর আঘাতের একটা ভারী শব্দ শোনা গেল।

দাঁত খিঁচিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে মুখ তুলে সোজা হয়ে উঠলো চিতাবাঘটা, টানটান হয়ে আক্রমণকারী জুলুর সমান উঁচু হয়ে দাঁড়ালো। এবার তার দিকে তেড়ে গেল জানোয়ারটা। বুনো আক্রোশে থাবা ছুঁড়ছে সামনে, শাদা মানুষটার মতো কালো মানুষটাকেও ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে। আবার কেরির প্রচণ্ড ঘা পড়লো সেটার চোয়ালের ওপর, চিৎ হয়ে পড়ে গেল জন্তুটা। আবার পুরোপুরি উঠে দাঁড়াবার আগেই ভারী মুগুরটা ফের ভীষণ বেগে আঘাত হানলো, এবার সেটা ভাগ্যক্রমে সজোরে পড়লো ঘাড়ের ওপর। নিস্তেজ হয়ে গেল জানোয়ারটা। মোচড় খাচ্ছে দেহ, দাঁতে দাঁত চেপে বসেছে, আছাড়িপিছাড়ির ফলে ছিটকে উঠছে মাটি আর পাতার রাশি। সেইসঙ্গে অবিরাম পড়ছে আঘাতের পর আঘাত। শেষ পর্যন্ত

একটা খিঁচুনির সঙ্গে চাপা গর্জন ছেড়ে জানোয়ারটা নিশ্চল হয়ে গেল। চূর্ণবিচূর্ণ খুলির ভেতর থেকে গড়িয়ে পড়ছে মগজ।

হ্যাডেন উঠে বসলো। তার জখমগুলো থেকে রক্ত ছুটেছে।

'তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো, নাহুন,' ক্ষীণস্বরে বললো সে, 'ধন্যবাদ তোমাকে।'

'আমাকে ধন্যবাদ দিয়ো না, কালো মন,' নাহুন উত্তর দিলো, 'রাজার আদেশ ছিল আমি যেন তোমাকে নিরাপদ রাখি। তবু বলতে হয়, বাঘটার প্রতি অন্যায্য আচরণ করা হয়েছে, কারণ নিঃসন্দেহে আমার জীবন বাঁচিয়েছে ও-ই।' মার্টিনিটা তুলে নিয়ে গুলি বের করে ফেললো সে।

ঠিক এ-রকম সময়ে হ্যাডেন জ্ঞান হারালো।

* * *

চব্বিশ ঘণ্টা পর চেতনা ফিরলো হ্যাডেনের। তার মনে হচ্ছে, স্বপ্নে-ভরা অস্বস্তিকর ঘুমের ভেতর দিয়ে সামান্যমাত্র সময় অতিবাহিত হয়েছে। ঘুমের মধ্যে মানুষের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেয়েছে সে, কিন্তু অর্থ বুঝতে পারেনি। টের পেয়েছে, তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে – কোথায় তা জানতে পারেনি।

চোখ মেলে হ্যাডেন দেখলো, ঝক্‌ঝকে তকতকে বড়ো একটা কুটিরের ভেতর কারোসের ওপর শুয়ে আছে সে। মাথার নিচে পশমের একটা পুঁটুলি। পাশেই এক বাটি দুধ। অসহ্য তৃষ্ণা পেয়েছে। বাটিটা ঠোঁটে তুলে ধরার জন্য হাত বাড়াবার চেষ্টা করলো সে। অবাক হয়ে দেখলো, একটু নড়ে উঠেই হাতটা মৃত মানুষের হাতের মতো তার পাশে পড়ে রইলো।

অধৈর্য দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে তাকালো সে। সাহায্য করার মতো কেউ নেই। কাজেই আর একমাত্র যা করার আছে তা-ই করলো সে – চুপচাপ পড়ে রইলো। ঘুমিয়ে পড়লো না, তবে চোখদুটো বন্ধ। এক ধরনের শান্ত-সমাহিত বিবশ ভাব সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো, ফিরে-পাওয়া চেতনা অনেকখানি আচ্ছন্ন হয়ে এলো আবার।

কিছুক্ষণ পরই মৃদু একটা কণ্ঠ শুনতে পেলো হ্যাডেন। মনে হচ্ছে, অনেক দূরে কথা বলছে কেউ, তবু প্রতিটি শব্দ সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

'কালো মন এখনও ঘুমুচ্ছে,' বলছে সেই কণ্ঠ, 'তবে রঙ ফিরে এসেছে মুখে। মনে হয় শিগ্‌গিরই জেগে উঠবে, হুঁশ ফিরে পাবে আবার।'

'ভয় নেই, নানিয়া, অবশ্যই ওর জ্ঞান ফিরবে, জখমগুলো তেমন মারাত্মক নয়,' অন্য একটা কণ্ঠ জবাব দিলো – নাহুনের কণ্ঠ। 'গায়ের ওপর বাঘের ওজন নিয়ে জোরে আছড়ে পড়েছিল কিনা – সেজন্যে এত লম্বা সময় ধরে অচেতন হয়ে আছে। মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, কিন্তু মরবে না ও নিশ্চয়।'

'মরে গেলে সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হতো,' নরম কণ্ঠ বলে উঠলো, 'এত সুন্দর মানুষটা – এত সুন্দর কোন শাদা মানুষ আমি কখনও দেখিনি।'

'আমার বুকের দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে ছিল যখন, তখন আর ওকে আমার সুন্দর মনে হয়নি,' ক্ষুব্ধ স্বরে বললো নাহুন।

'তা বটে, কিন্তু ভেবে দেখো,' উত্তর দিলো নারীকণ্ঠ, 'সেটিওয়েইয়োর কাছ থেকে পালাতে চেয়েছিল লোকটা, আর তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো নানিয়া। 'তাছাড়া সে তোমাকে তার সঙ্গে যেতেও বলেছিল। হয়তো ভালোই হতো যদি তুমি যেতে – মানে যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে!'

'কিভাবে করতাম আমি সে-কাজ, শুনি?' ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলো নাহুন। 'রাজার আদেশ গ্রাহ্য করবো না আমি বলতে চাও?'

'রাজা!' গলা চড়িয়ে জবাব দিলো নানিয়া। 'রাজার কাছে তোমার কিসের দায়? তাঁর সেবা করেছো তুমি বিশ্বস্তভাবে, আর তার পুরস্কার হচ্ছে, কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন আমাকে – যার কথা ছিল তোমার স্ত্রী হওয়ার। আমি – আমি কিছুতেই...' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো সে, সেইসঙ্গে বলে চললো, 'যদি তুমি সত্যি আমাকে ভালোবাসতে, তাহলে আমার কথা এবং নিজের কথা আরেকটু ভাবতে – কম ভাবতে ওই কৃষ্ণপ্রবর আর তাঁর হুকুমের কথা। চলো আমরা পালিয়ে যাই, নাহুন, এই বর্শা আমাকে বিদ্ধ করার আগেই চলো আমরা নাটালে পালিয়ে যাই।'

'কেঁদো না, নানিয়া,' নাহুন বললো, 'কেন তুমি আমার হৃদয়কে কর্তব্য আর ভালোবাসার দ্বন্দ্বে ফেলে ছিঁড়ে দু'টুকরো করতে চাইছো? তুমি তো জানো আমি একজন যোদ্ধা, রাজা যে-পথে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন সে-পথেই আমাকে চলতে হবে। আমার বিশ্বাস, অচিরেই মৃত্যু হবে আমার – কারণ মৃত্যু আমি চাইছি, এবং তারপর আর কিছুই আমাকে স্পর্শ করবে না।'

'তোমাকে কিছুই স্পর্শ করবে না, নাহুন, তুমি তো বেশ আছো; কিন্তু আমার কী হবে? তবু, তোমার কথাই ঠিক, আমি জানি। আমাকে ক্ষমা করো তাই। যোদ্ধা না হলেও আমি নারী, রাজার আজ্ঞা আমাকেও মানতেই হবে।'

দু'হাতে নাহুনের গলা বেষ্টন করে তার বুকে মুখ গুঁজে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো নানিয়া।

চার

একটু পরেই বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে নানিয়াকে ছেড়ে নাহুন ঘরের সংকীর্ণ প্রবেশপথ দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। কথাটা হ্যাডেন ঠিক ধরতে পারলো না। চোখ খুললো সে, চারদিকে তাকালো।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, লাল আলোর একটা রশ্মি ঘরের ছোট প্রবেশমুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পুরো ঘর নরম রক্তিম আভায় ভরিয়ে তুলেছে। কুটিরের ঠিক মাঝখানে ছাদ ঠেক দিয়ে রাখা থর্নউডের একটা খুঁটি। আগুনের ধোঁয়ায় সেটা কালো রঙ ধারণ করেছে। সেই খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নানিয়া – অপরূপ আলোর দ্যুতি তার সর্বাঙ্গ ঘিরে আছে। অচঞ্চল বিষাদের অনবদ্য ছবি যেন।

জুলু নারীদের মধ্যে মাঝেমধ্যে যেমন দেখা যায়, নানিয়া সুন্দর – এতো সুন্দর যে তার দিকে তাকানোমাত্র দুলে উঠলো শাদা মানুষটির হৃদয়, গলার কাছে নিঃশ্বাস আটকে গেল মুহূর্তের জন্যে।

মেয়েটির পরিচ্ছদ খুব সাধারণ। কাঁধ থেকে ঝুলে আছে হাতাবিহীন ঢিলা আঙরাখা, সামনের দিকটা খোলা। নরম শাদা কোন জিনিস দিয়ে তৈরী সেটা, কিনারা ঘেঁষে নীল পুঁতির সারি। কোমর বেষ্টন করে রয়েছে হরিণের চামড়ার মুচা, সেটাতেও নীল পুঁতির নকশা। কপালে এবং বাঁ হাঁটুতে ধূসর পশমের ফালি বাঁধা। ডান হাতের কবজিতে ঝক্‌ঝকে একটা তামার বালা। ব্রোঞ্জের দ্যুতিমাখা নগ্নপ্রায় দীর্ঘ দেহের গড়ন নিখুঁত সুন্দর। স্বজাতির সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে তার মুখের আদলের মিল সামান্যই, সে-মুখে বরং আরবীয় বা সেমিটিক পূর্বপুরুষের রক্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। ডিম্বাকৃতি মুখের ছাঁদ ধারালো অথচ কমনীয়। ভ্রূ-দুটো বাঁকানো, বিকশিত ঠোঁটের দুই কোণ ঈষৎ নমিত। ছোট আকারের কানদুটোর পেছনে নিকষকালো ঢেউখেলানো চুলের রাশি কাঁধের ওপর নেমে এসেছে। যতদূর কল্পনায় আনা সম্ভব, ততটাই সুন্দর তার মদির কালো চোখজোড়া।

মিনিটখানেক একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো নানিয়া। সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত তার মিষ্টি মুখখানার সৌন্দর্য ততক্ষণ ধরে দু'চোখ ভরে উপভোগ করলো হ্যাডেন। শেষ পর্যন্ত নানিয়া গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো। হ্যাডেন জেগে উঠেছে দেখে চমকে উঠলো একটু। বুকের ওপর আঙরাখা টেনে দিয়ে এগিয়ে এলো তার দিকে – বলা উচিত, হালকা পায়ে ভেসে এলো।

'সর্দারের ঘুম ভেঙেছে,' জুলু ভাষায় মৃদু স্বরে বললো সে। 'কিছু চাই কি তাঁর?'

'হ্যাঁ, দেবী, ভারী তেষ্টা পেয়েছে,' জবাব দিলো হ্যাডেন, 'কিন্তু বড্ড দুর্বল আমি।'

হাঁটু মুড়ে পাশে বসলো নানিয়া, বাঁ বাহু দিয়ে তাকে উঁচু হতে সাহায্য করে ডান হাত দিয়ে তার ঠোঁটে লাউয়ের খোলসের পাত্র তুলে ধরলো।

কীভাবে ঘটলো ব্যাপারটা, ঠিক বলতে পারবে না হ্যাডেন, তবে চুমুক শেষ হবার আগেই এক আশ্চর্য পরিবর্তনের স্পর্শ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। কারণ যা-ই হোক – অরণ্যবাসী মেয়েটির স্পর্শ হোক, হরিণশিশুর মতো তার অদ্ভুত সৌন্দর্য হোক, কিংবা তার চোখের দৃষ্টিতে মাখা কোমল মমতাই হোক – মূল কথা একই। হ্যাডেনের বিক্ষুব্ধ দুর্বার প্রকৃতির কোন গোপন তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলেছে নানিয়া, অকস্মাৎ তীব্র আসক্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে হৃদয়। এই আকর্ষণের ভেতর মহিমা যদি না-ও থাকে, তা অন্তত বাস্তব। ধমনীর রক্তস্রোতে উথলে উঠেছে যে অনুভব তার তাৎপর্য বুঝতে মুহূর্তের জন্যেও ভুল হয়নি হ্যাডেনের। যা সত্য তা সে কখনও এড়িয়ে যায়নি।

'ঈশ্বরের দিব্যি!' মনে মনে বললো সে, 'এক কালো সুন্দরীর প্রেমে পড়েছি আমি প্রথম দর্শনে – এমন গভীর প্রেমে আগে কখনও পড়িনি। ব্যাপারটা বিদঘুটে হলেও কিছু ফায়দা অবশ্যই মিলবে। দুর্ভাগ্য নাহুনের, কিংবা সেটিওয়েইয়োর, কিংবা দু'জনেরই। মেয়েটা সমস্যার কারণ হয়ে উঠলে আমি তো যে-কোন মুহূর্তে তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারি।'

রক্তের আলোড়নের ফলে নতুন করে দুর্বলতা ছড়িয়ে পড়েছে শরীরে। পশমের বালিশে মাথা রেখে হ্যাডেন আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। চিতাবাঘের আক্রমণে যেসব ক্ষত হয়েছে নানিয়া সেগুলোতে পাতা পিষে তৈরী এক ধরনের স্থানীয় মলম লাগিয়ে দিচ্ছে। হ্যাডেন তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

প্রায় স্পষ্ট অনুভব করছে সে, তার মনের মধ্যে যে ভাবনা চলেছে তার কিছুটা যেন আপনি পৌঁছে গেছে মেয়েটির মনে। অন্তত লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মলমের প্রলেপ দিতে গিয়ে তার হাত কাঁপছে একটু একটু। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করতে চাইছে সে।

'হয়ে গেছে, ইনকুস,' বিনীতভাবে বলে সোজা হলো সে। আবার খুঁটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

'ধন্যবাদ, দেবী,' বললো হ্যাডেন, 'বড়ো মমতা-মাখা তোমার হাত।'

'আমাকে ওভাবে ডাকবে না, ইনকুস,' উত্তর দিলো নানিয়া, 'আমি তো কোন সর্দার নই, আমি শুধু এক মোড়লের কন্যা। আমার বাবার নাম উমগোনা।'

'আর তোমার নাম নানিয়া,' বলে উঠলো হ্যাডেন। 'উঁহু, অবাক হ'য়ো না, তোমার কথা আমি আগেই শুনেছি। তা, নানিয়া, তুমি শিগ্‌গিরই হয়তো একজন সর্দার-নারী হয়ে যাবে – ওই যে ওদিকে রাজার ক্রালে।'

'হায়! হায়, হায়!' বিলাপ করে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলো নানিয়া।

'দুঃখ ক'রো না নানিয়া। ঝোপের সারি কখনও এতো উঁচু কিংবা এতো ঘন হতে পারে না যে তা ডিঙোনো যাবে না বা তার ভেতর দিয়ে গলে যাওয়া যাবে না।'

মুখ থেকে হাত নামিয়ে সাগ্রহে হ্যাডেনের দিকে চাইলো নানিয়া। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে হ্যাডেন আর কথা বাড়ালো না।

'এখানে কী করে এলাম আমি, নানিয়া?'

'নাহুন আর আর তার সঙ্গীরা তোমাকে বয়ে এনেছে, ইনকুস।'

'সত্যি বলতে কি, যে-চিতাবাঘটা আমার ওপর হামলা করেছিল তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ বোধ করতে শুরু করেছি। হ্যাঁ, নাহুন সাহসী লোক, বিরাট উপকার করেছে আমার। আমার বিশ্বাস, হয়তো এর প্রতিদান আমি দিতে পারবো – তোমাকে, নানিয়া।'

* * *

নানিয়া এবং হ্যাডেনের এই ছিল প্রথম সাক্ষাৎ। তবে নানিয়ার কোন আগ্রহ না থাকলেও হ্যাডেনের অসুস্থতা সংক্রান্ত প্রয়োজনে এবং পরিস্থিতির কারণে তাদের সাক্ষাৎ আরও অনেকবার ঘটলো। শ্বেতাঙ্গ হ্যাডেনকে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছে নানিয়া – জুলু মেয়েটাকে কবজা করার সঙ্কল্প থেকে মুহূর্তের জন্যও সে বিচ্যুত হলো না। নিজের মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্যে মেয়েটাকে নাহুনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টায় তার সমস্ত ক্ষমতা ও আকর্ষণশক্তি নিয়োজিত করলো। তবে প্রণয়প্রার্থী হিসেবে হ্যাডেন অমার্জিত নয় মোটেই; সাবধানে এগোলো সে, নানিয়াকে ঘিরে স্তুতি আর মনোযোগের জাল বুনে চললো। মনে আশা, প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হবে মেয়েটার মনের ওপর।

সত্যি বলতে কি, প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে হতো – কারণ নানিয়া নারী, সহজ-সরল নারী; কিন্তু হলো না একটিমাত্র বিষয়ের জন্য, যা তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। সে নাহুনকে ভালোবাসে। তার হৃদয়ে আর কোন পুরুষের স্থান নেই – সে পুরুষ শাদা হোক আর কালোই হোক। হ্যাডেনের প্রতি অমায়িক ও সহৃদয় আচরণ করতে থাকলো সে, তার বেশি কিছু নয়। তার হৃদয়ে ঠাঁই করে নেয়ার জন্যে হ্যাডেনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম প্রয়াস সে লক্ষ করছে বলেও মনে হলো না। এজন্যে কিছুদিন হতবুদ্ধি হয়ে রইলো হ্যাডেন। শেষে তার মনে পড়লো, প্রণয়প্রার্থী পুরুষ খোলাখুলিভাবে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ না করা পর্যন্ত কোন জুলু মেয়ে সাধারণত নিজের অনুভূতি ব্যক্ত হতে দেয় না। তার মানে, কথাটা সরাসরি বলে ফেলা এখন জরুরী হয়ে পড়েছে।

একবার মনস্থির করার পর তাকে আর সুযোগের জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। তার ক্ষতগুলো প্রায় নিরাময় হয়ে গেছে বলা যায়, এখন সে

প্রায়ই ক্রালের আশপাশের এলাকায় হাঁটাহাঁটি করে বেড়ায়। উমগোনার বাড়ির শ' দুয়েক গজ দূরে একটা ঝরনা আছে – নানিয়া বাঁধা নিয়মে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সেখানে গিয়ে বাবার গৃহস্থালির জন্য খাবার পানি নিয়ে আসে। এই ঝরনা আর ক্রালের ভেতরের পথটা গিয়েছে ঝোপজঙ্গলে ছাওয়া একটা জায়গার মধ্য দিয়ে। সেখানে একদিন সূর্যাস্তের দিকে একটা গাছের নিচে হ্যাডেন অবস্থান নিলো। একটু আগে সে লক্ষ করেছে, যথারীতি ঝরনার দিকে রওনা হয়েছে নানিয়া।

মিনিট পনেরো পরে নানিয়াকে আবার দেখা গেল। মস্ত একটা লাউয়ের খোলভর্তি পানি মাথায় করে বয়ে নিয়ে ফিরছে সে। পোশাক বলতে এখন তার পরনে একমাত্র মুচা ছাড়া আর কিছু নেই; একটিমাত্র আঙরাখা তার, পানি ছলকে পড়ে ভিজে যেতে পারে বলে সেটা পরেনি। হ্যাডেন দেখতে পাচ্ছে, পথ বেয়ে এগিয়ে আসছে নানিয়া, দু'হাত নিতম্বের ওপর রাখা, অস্তায়মান সূর্যের আলোর পটভূমিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার অনবদ্য নগ্ন অবয়ব। হ্যাডেন ভাবছে, কিসের ছুতোয় তার সঙ্গে কথা বলা যায়।

দৈবক্রমে ভাগ্য হ্যাডেনের সহায় হলো। নানিয়া কাছাকাছি এসে পড়েছে, ঠিক এমন সময় একটা সাপ মেয়েটার পায়ের সামনে দিয়ে সড়সড় করে রাস্তা পার হয়ে গেল। চমকে উঠে চট্ করে পিছিয়ে গেল নানিয়া, অমনি উল্টে পড়ে গেল পানিভর্তি লাউয়ের খোল।

হ্যাডেন এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলো সেটা।

'একটু দাঁড়াও এখানে,' হেসে বললো সে, 'আমি আবার ভরে এনে দিচ্ছি।'

'না, ইনকুস,' প্রবল আপত্তি জানালো নানিয়া, 'এ মেয়েদের কাজ।'

'আমাদের সমাজে,' হ্যাডেন বললো, 'পুরুষেরা মেয়েদের কাজ করে দিতে ভালোবাসে।' ঝরনার দিকে রওনা হয়ে গেল সে, পেছনে নানিয়া অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

আবার সেখানে এসে পৌঁছবার আগেই নানিয়ার মনোরঞ্জনের এই চেষ্টার জন্য মনে মনে খেদ করতে হলো হ্যাডেনকে। কারণ হাতলবিহীন লাউয়ের খোল কাঁধে করে বয়ে আনতে গিয়ে ছলকে পড়া পানিতে ভিজে নাজেহাল হতে হয়েছে তাকে। এ নিয়ে অবশ্য নানিয়াকে সে কিছুই বললো না।

'এই যে তোমার পানি, নানিয়া – ক্রাল পর্যন্ত বয়ে দিয়ে আসি?'

'না, ইনকুস, ধন্যবাদ তোমাকে। আমাকে দাও ওটা, ভার বয়ে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো।'

'একটু দাঁড়াও, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। ওহ্, নানিয়া, এখনও দুর্বল রয়ে গেছি – বেঁচে যে আছি, সে শুধু তোমার কারণেই।'

'তোমাকে যে বাঁচিয়েছে, সে নাহুন – আমি নই, ইনকুস।'

'নাহুন বাঁচিয়েছে আমার দেহ – কিন্তু তুমি, নানিয়া, শুধু তুমিই পারো আমার হৃদয়কে রক্ষা করতে।'

'অদ্ভুতভাবে কথা বলছো তুমি, ইনকুস।'

'তাহলে আমাকে পরিষ্কার করেই বলতে হয়, নানিয়া। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

নানিয়ার বাদামী চোখজোড়া বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো।

'তুমি, একজন শাদা সর্দার, ভালোবাসো আমাকে, একটা জুলু মেয়েকে? সে কী করে হয়?'

'জানি না, নানিয়া, তবে ব্যাপারটা তা-ই। আর তুমি যদি অন্ধ না হতে, নিজেই সেটা বুঝতে। আমি ভালোবাসি তোমাকে – তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।'

'না, ইনকুস, এ অসম্ভব। আমি একজনের বাগ্‌দত্তা।'

'তা বটে,' বললো হ্যাডেন, 'রাজার বাগ্‌দত্তা।'

'না, নাহুনের বাগ্‌দত্তা।'

'কিন্তু রাজাই তো তোমাকে বিয়ে করবেন এক সপ্তাহের মধ্যে – তাই নয় কি? রাজার বদলে যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি সেটাই কি তুমি ভালো মনে করবে না?'

'সেরকম ভাবাই স্বাভাবিক, ইনকুস – রাজার সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে আমি বরং তোমার সঙ্গেই যেতে চাইতাম। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমি চাই নাহুনকে বিয়ে করতে। হয়তো তাকে বিয়ে করতে আমি পারবো না, কিন্তু তা হলেও অন্তত রাজার মেয়েমানুষদের একজন আমি কখনও হবো না।'

'কীভাবে তুমি তা ঠেকাবে, নানিয়া?'

'জল আছে মেয়েদের ডুবে মরবার জন্যে, গলায় দড়ি দেবার জন্যে গাছ আছে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো নানিয়া।

'সে বড়ো দুঃখের হবে, নানিয়া। এত সুন্দর তুমি – তুমি মরতে পারো না।'

'সুন্দর হই আর কুৎসিত হই, মরতে আমাকে হবেই, ইনকুস।'

'না, না, আমার সঙ্গে এসো – উপায় আমি একটা বের করবো – আমার স্ত্রী হবে তুমি,' বলতে বলতে একহাতে নানিয়ার কোমর বেষ্টন করে তাকে কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করলো নাহুন।

ঝটকা দিয়ে সরে গেল না নানিয়া, কিন্তু নিখুঁত আভিজাত্যময় ভঙ্গিতে নিজেকে হ্যাডেনের বাহুপাশ থেকে ছাড়িয়ে নিলো।

'তুমি আমাকে সম্মানিত করেছো, সেজন্যে ধন্যবাদ, ইনকুস,' শান্ত গলায় বললো সে, 'কিন্তু ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছো না। নাহুনের স্ত্রী আমি – আমি নাহুনের। কাজেই নাহুন বেঁচে থাকতে অন্য কোন পুরুষের দিকে আমি দৃষ্টি দিতে পারি না। আমাদের তেমন রীতি নেই, ইনকুস, কারণ আমরা শাদা

মেয়েদের মতো নই, আমরা সহজ-সরল, অজ্ঞ; জীবনসঙ্গী হবো বলে কোন পুরুষকে যখন কথা দিই, মৃত্যু পর্যন্ত সে-কথা রক্ষা করি।'

'তা-ই দেখছি,' বললো হ্যাডেন। 'তাহলে এখন তুমি নাহুনকে গিয়ে বলবে আমি তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি?'

'না, ইনকুস, তোমার গোপন কথা কেন নাহুনকে বলতে যাবো? আমি তো তোমাকে "না" বলেছি, "হ্যাঁ" নয় – কাজেই এসব জানার কোন অধিকার তার নেই,' বলে পানির পাত্র তুলে নেবার জন্যে ঝুঁকলো নানিয়া।

দ্রুত পরিস্থিতি বিচার করলো হ্যাডেন। প্রত্যাখ্যান তাকে সফলত্মলাভের জন্য আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছে মাত্র। জরুরী এই অবস্থায় হঠাৎ করেই একটা পরিকল্পনা, কিংবা বলা যায় পরিকল্পনার একটা প্রাথমিক কাঠামো, ধরা দিলো তার চিন্তায়। আদর্শ কোন পরিকল্পনা সেটা নয়, কেউ কেউ হয়তো এমন কথা মনে আসামাত্র তা থেকে পিছিয়ে যেতো। কিন্তু এক জুলু রমণীর কাছে হেরে যাবার গ্লানিতে ভোগার কোন ইচ্ছে হ্যাডেনের নেই বলে সত্যি বলতে কি দুঃখের সঙ্গেই সে সিদ্ধান্ত নিলো, তার বিবেচনামতে ন্যায্য উপায়ে লক্ষ্য অর্জন করতে যেহেতু ব্যর্থ হয়েছে, সেহেতু আরেকটু বাঁকা পথের আশ্রয় তাকে নিতেই হবে।

'নানিয়া,' বললো সে, 'সৎ অকপট মেয়ে তুমি – তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সেইসঙ্গে তোমাকে ভালোবাসি, আগেই বলেছি। তবে তুমি যদি আমার কথা না শুনতে চাও, তাহলে আর কিছু বলার থাকে না। আর তাছাড়া নিজের গোত্রের কাউকে বিয়ে করাই হয়তো তোমার জন্যে বেশি ভালো হবে। কিন্তু, নানিয়া, নাহুনকে তো তুমি কখনও বিয়ে করতে পারবে না, কারণ রাজা তোমাকে নিয়ে যাবেন। আর তিনি যদি তোমাকে অন্য কোন লোকের হাতে তুলে না দেন, হয় তুমি তাঁর "সেবিকাদের" একজন হয়ে যাবে, নয়তো তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে, যেমন তুমি বললে, মৃত্যুকে বরণ করে নেবে। এখন আমার কথা শোনো – তোমাকে ভালোবাসি এবং তোমার মঙ্গল চাই বলেই আমি এসব বলছি। নাহুনকে নিয়ে নাটালে পালিয়ে যাও না কেন? সেখানে তো তোমরা সেটিওয়েইয়োর হাতের নাগাল থেকে দূরে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে!'

'সেটাই আমার ইচ্ছে, ইনকুস, কিন্তু নাহুন তাতে রাজি হবে না। সে বলে, তোমাদের শাদা মানুষদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে, এবং রাজার অবাধ্য সে হবে না, তাঁর সেনাবাহিনী ছেড়ে পালিয়ে যাবে না।'

'তাহলে বলতে হয়, সে তোমাকে যথেষ্ট ভালোবাসে না, নানিয়া। সেক্ষেত্রে অন্তত নিজের কথা তোমাকে ভাবতে হবে। কথাটা তোমার বাবাকে বলো গোপনে, তার সঙ্গে পালিয়ে যাও – ঠিক দেখবে, খুব শিগ্‌গির নাহুন তোমাদের পিছু নেবে। আর হ্যাঁ, আমি নিজেও তোমাদের সঙ্গে পালাবো, কারণ আমারও বিশ্বাস যুদ্ধ বাধবেই, এবং তাহলে এ-দেশে একজন শাদা মানুষের দশা হবে ঈগলের ঝাঁকের মধ্যে ভেড়ার ছানার মতো।'

'নাহুন গেলে আমি যাবো, ইনকুস। কিন্তু নাহুনকে ছাড়া আমি পালিয়ে যেতে পারবো না। তার চেয়ে বরং এখানেই থাকবো আমি, প্রাণ দেবো।'

'তাহলে বলবো, এতো রূপ তোমার, এতো ভালোবাসো নাহুনকে – নিশ্চয় তার অপরাধবোধ তুমি ভুলিয়ে দিতে পারো, তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজি করাতে পারো। আগামী চার দিনের মধ্যে রাজার ক্রালের পথে আমাদের যাত্রা করতে হবে। নাহুনকে যদি রাজি করাতে পারো, আমরা সহজেই দক্ষিণমুখো হয়ে আমাজুলু রাজ্য আর নাটালের মাঝখানের নদী পার হয়ে চলে যেতে পারবো। আমাদের সবার ভালোর জন্যে, এবং বিশেষ করে তোমার নিজেরই জন্যে কাজটা করতে চেষ্টা করো, নানিয়া। তোমাকে ভালোবেসেছি আমি, এখন তোমাকে বাঁচাতে চাই। নাহুনের সঙ্গে দেখা করো, নিজে যেমন ভালো বোঝো সেভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করো – তবে এখনই তাকে ব'লো না যে আমি পালানোর স্বপ্ন দেখছি, কারণ তাহলে আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখা হবে।'

'ঠিক আছে, তা-ই করবো, ইনকুস,' নানিয়া ব্যগ্র স্বরে জবাব দিলো। 'আর হ্যাঁ, তোমার আন্তরিকতার জন্যে ধন্যবাদ দিই। ভয় নেই, তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না – তার চেয়ে বরং আগে প্রাণ দেবো। বিদায়।'

'বিদায়, নানিয়া,' বলে তার হাত তুলে নিয়ে ঠোঁট ছোঁয়ালো হ্যাডেন।

* * *

বেশ রাত হয়েছে। ঘুমোতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে হ্যাডেন, এমন সময় কুটিরের প্রবেশমুখ বন্ধ করে রাখা তক্তার ওপর মৃদু টোকার শব্দ শুনতে পেলো সে।

'এসো,' দরজা খুলে দিয়ে বললো সে। নিজের হাতে-ধরা ছোট লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পেলো, নিচু হয়ে ঘরে ঢুকলো নানিয়া, তার পেছনে বিশালদেহী নাহুন।

'ইনকুস,' দরজা আবার বন্ধ করে দেবার পর ফিস্‌ফিস্ করে বললো নানিয়া, 'নাহুনকে অনেক করে বুঝিয়েছি আমি, সে রাজি হয়েছে পালাতে; তাছাড়া আমার বাবাও যাবে।'

'তাই নাকি, নাহুন?' হ্যাডেন জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, তাই,' লজ্জায় মুখ নত করে বললো জুলু যুবক; 'রাজার হাত থেকে এই মেয়েটাকে বাঁচাতে চাই বলে, আর ওর ভালোবাসা আমার হৃদয় কুরে কুরে খাচ্ছে বলে আমি আমার সম্মান বিকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি, নানিয়া, এবং তোমাকেও বলছি, শাদা মানুষ, উমগোনাকেও এইমাত্র বলে এসেছি, আমার ধারণা, এই পালিয়ে যাওয়া কিছুতেই মঙ্গলের হবে না। আমরা যদি ধরা পড়ি কিংবা কেউ আমাদের ধরিয়ে দেয়, মারা পড়বো আমরা – প্রত্যেকে।'

'ধরা পড়বার সম্ভাবনা মোটেই নেই,' বাধা দিয়ে অধীর স্বরে বলে উঠলো নানিয়া, 'কে আছে আমাদের ধরিয়ে দেবার মতো, একমাত্র এই ইনকুস যদি না –'

'যা তার করার কোন সম্ভাবনা নেই,' হ্যাডেন শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'কারণ সে-ও তোমাদের সঙ্গে পালাতে চাইছে, এবং তার নিজের জীবনও বিপন্ন।'

'ঠিকই বলেছো, কালো মন,' বললো নাহুন, 'তা না হলে, শুনে রাখো, তোমাকে আমি বিশ্বাস করতাম না।'

এই স্পষ্ট বচন হ্যাডেন গায়ে মাখলো না। অনেক রাত পর্যন্ত তারা সেখানে একসঙ্গে বসে নিজেদের পরিকল্পনা স্থির করলো।

* * *

পরদিন সকালে প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডার শব্দে হ্যাডেনের ঘুম ভেঙে গেল।

কুটির থেকে বেরিয়ে সে দেখলো, বাদানুবাদ চলছে উমগোনা আর এক মোটাসোটা কুটিলদর্শন কাফ্রি সর্দারের মধ্যে। সর্দার ক্রালে এসেছে একটা টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চেপে। অচিরেই হ্যাডেন আবিষ্কার করলো, তার নাম মাপুতা। এই সেই লোক যে নানিয়াকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, আর এরই কারণে হতভাগ্য নাহুন আর উমগোনা রাজার কাছে গিয়েছিল তাদের আবেদন নিয়ে। এ-মুহূর্তে লোকটা ভয়ানক গালাগাল করছে উমগোনাকে; অভিযোগ করছে, তার কতকগুলো ষাঁড় চুরি করেছে উমগোনা, আর গাভীগুলোকে এমনভাবে মন্ত্র করেছে যে সেগুলো দুধ দিচ্ছে না।

চুরির অভিযোগ যে সত্যি নয় সেটা প্রমাণ করা তুলনামূলকভাবে সহজ হলো, কিন্তু জাদুটোনার ব্যাপারটা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলতেই থাকলো।

'তুমি একটা কুকুর – কুকুরের বাচ্চা!' চিৎকার করে বলছে মাপুতা, কম্পমান ক্রুদ্ধ উমগোনার মুখের ওপর মস্ত মুঠি নাচাচ্ছে। 'তোমার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছিলে, তারপর কিনা আবার তার বিয়ে দেবে ঠিক করেছো ওই *উমফাগোজান* – ওই ছোটলোক সেপাইয়ের সঙ্গে, জম্‌বার ছেলে নাহুনের সঙ্গে। দু'জন মিলে রাজার কাছে গিয়ে আমার নামে নালিশ করে তাঁর কান বিষিয়েছো, তার ফলে রাজাকে নিয়ে বিপাকে পড়তে হয়েছে আমাকে, আর এখন তুমি মন্ত্র করেছো আমার গরুর পালকে। ঠিক আছে, তোমাকে শায়েস্তা করে ছাড়বো আমি, জাদুকর। অপেক্ষা করো – হিম সকালে ঘুম থেকে উঠে একদিন দেখতে পাবে তোমার বেড়া লাল হয়ে উঠেছে আগুনে, জল্লাদের দল দাঁড়িয়ে আছে ফটকের বাইরে তোমাকে আর তোমার লোকজনকে বর্শার ঘায়ে খতম করার জন্যে –'

নাহুন এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিল। এবার সে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করলো।

'বেশ,' বললো সে, 'অপেক্ষা করবো আমরা, তবে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে নয়, সর্দার। *হাম্‌বা* (যাও)!' বলে মোটাসোটা বুড়ো বদমাশটার ঘাড় খামচে ধরে এমন প্রচণ্ড জোরে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিলো যে ছোট ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে গেল সে।

হেসে ফেললো হ্যাডেন। স্নান করবে বলে নদীর দিকে রওনা হলো।

নদীর কাছাকাছি পৌঁছতেই হ্যাডেন দেখতে পেলো, পায়ে-চলা পথ ধরে ঘোড়ায় চেপে চলেছে মাপুতা। তার মাথার পাগড়ি কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে, ঠোঁটদুটো বেগুনি, কালো মুখখানা রাগে তেতে উঠেছে।

'রেগে আগুন হয়ে চলেছে ওই একজন,' বিড়বিড় করে বললো হ্যাডেন। 'আচ্ছা, এখন যদি...' বলে এমনভাবে ওপরদিকে মুখ তুলে তাকালো যেন কোন দৈবাদেশ প্রত্যাশা করছে।

মনে হলো অবতীর্ণ হলো দৈবাদেশ – বোধ হয় কান উন্মুক্ত পেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে পরামর্শ দিয়ে গেল শয়তান। যাই হোক, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই হ্যাডেনের পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে গেল, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সে এগিয়ে চললো মাপুতার সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

'মঙ্গল হোক, সর্দার,' বললো সে; 'ওদিকে ওরা বোধ হয় তোমার সঙ্গে বেশ রুক্ষ ব্যবহার করেছে। আমার তো নাক গলানোর ক্ষমতা নেই, দৃশ্যটা সইতে পারলাম না বলে চলে এলাম। ভারী লজ্জার কথা, উঁচু পদের একজন বয়স্ক মানী লোককে আবর্জনার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে, বীয়ার খেয়ে মাতাল হয়ে একজন সেপাই তাঁকে এভাবে অপদস্থ করবে!'

'লজ্জারই কথা, শাদা মানুষ!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মাপুতা; 'ঠিকই বলেছো। তবে একটু সবুর করো। আমি, এই মাপুতা, ওই পাথর উল্টে গড়িয়ে দেবো, ওই ষাঁড়টাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো চিৎ করে। এর পরের বার যখন ফসল পাকবে, হলফ করে বলছি আমি, সে-ফসল তোলার জন্যে নাহুন থাকবে না, উমগোনা থাকবে না, তার ক্রালেরও কেউ থাকবে না।'

'কাজটা করবে কীভাবে, মাপুতা?'

'জানি না, তবে উপায় একটা বের করবো। হ্যাঁ, শুনে রাখো, উপায় একটা বের করা হবে।'

যেন খুব মন দিয়ে কিছু একটা ভাবছে এমন ভঙ্গিতে হ্যাডেন ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর আস্তে আস্তে চাপড় দিতে লাগলো। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে সর্দারের চোখের ওপর চোখ রেখে বললো:

'যদি উপায় একটা বাতলে দিই, মোক্ষম এবং অব্যর্থ উপায়, কী দেবে আমাকে, মাপুতা? ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিতে পারবে নাহুন আর উমগোনার ওপর। আমিও তো দেখেছি নাহুনের বজ্জাতি, আর উমগোনার জাদুর কারণে সাংঘাতিক অসুখের কবলে পড়েছি।'

'বিনিময়ে তুমি কী চাও, শাদা মানুষ?' মাপুতা সাগ্রহে জানতে চাইলো।

'সামান্য একটা জিনিস, সর্দার, তেমন কিছুই নয়, কেবল ওই নানিয়া মেয়েটাকে – ব্যাপার হলো, ওকে আমার একটু মনে ধরেছে।'

'আমি নিজেই ওকে চেয়েছিলাম, শাদা মানুষ, কিন্তু উলুনডিতে যিনি বসে আছেন তাঁর হাত পড়েছে ওর ওপর।'

'ও কিছু নয়, সর্দার। "উলুনডিতে যিনি বসে আছেন" তাঁর সঙ্গে কিছু একটা ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারবো। এখানে সর্বেসর্বা হচ্ছো তুমি, তোমার সঙ্গেই আমি রফা করতে চাই। শোনো: আমার সাধ যদি মেটাও, তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী শত্রুদের ওপর প্রতিশোধের ব্যবস্থাই শুধু করে দেবো না, মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দেবে যখন, তোমাকে আমি দেবো এই রাইফেলটা আর একশো কার্তুজ।'

মাপুতা স্পোর্টিং মার্টিনিটার দিকে তাকালো, চোখদুটো চক্‌চক্ করে উঠলো তার।

'ভালো কথা,' বললো সে, 'খুব ভালো কথা। প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, এমন একটা বন্দুক যদি আমার থাকতো যেটা দিয়ে শিকার করা যেতো, আবার অনেক দূর থেকে শত্রুরও মোকাবেলা করতে পারতাম! ওটা দেবে বলে কথা দাও, শাদা মানুষ, তাহলে মেয়েটাকে অবশ্যই পাবে তুমি – যদি আমি দিতে পারি।'

'হলফ করে বলছো তুমি, মাপুতা?'

'চাকা-র মাথার নামে, আমার পিতৃপুরুষদের আত্মার নামে শপথ করছি।'

'বেশ। উমগোনা, তার মেয়ে নানিয়া, আর নাহুনের মতলব হচ্ছে, এখন থেকে চার দিনের দিন ভোরবেলা ক্রোকোডাইল ড্রিফ্‌ট্ নামের গিরিপথ ধরে নদী পার হয়ে নাটালে গিয়ে উঠবে, রাজার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবে। সঙ্গে নিয়ে যাবে তাদের গরুবাছুর। আমিও থাকবো ওদের দলে, কারণ ওরা জানে আমি ওদের গোপন পরিকল্পনা জেনে ফেলেছি – এখন দলছুট হবার চেষ্টা করলে ওরা আমাকে খুন করবে। শোনো এখন: সীমান্তের তুমিই সর্দার, ওই গিরিপথের দেখাশোনার দায়িত্বও তোমার। রাতের বেলা কিছু লোকজন নিয়ে তুমি গিরিপথের ওপরের দিকে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে থেকে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবে। প্রথমে গরু আর বাছুরের পাল তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নদী পার হবে নানিয়া – সে-রকমই কথা হয়েছে – তাকে সাহায্য করবো আমি। তারপর উমগোনা আর নাহুন যাবে ষাঁড় আর বকনা-বাছুরগুলো নিয়ে। এ-দু'জনের ওপর চড়াও হবে তোমরা, ওদের শেষ করে দিয়ে গরুর পাল আটক করবে। পরে আমি তোমাকে রাইফেলটা দিয়ে দেবো।'

'রাজা যদি মেয়েটাকে চেয়ে পাঠান, তখন কী হবে, শাদা মানুষ?'

'তখন তুমি উত্তর দেবে, আলো-আঁধারির মধ্যে নানিয়াকে তুমি ঠিক চিনে উঠতে পারোনি, সেই সুযোগে সে তোমার হাত ফসকে পালিয়ে গেছে। আরও বলবে, মেয়েটাকে তুমি প্রথমে এই ভয়ে ধরতে চেষ্টা করোনি পাছে তার চিৎকার শুনে পুরুষগুলো সতর্ক হয়ে গিয়ে নাগালের বাইরে পালিয়ে যায়।'

'বেশ। কিন্তু একবার নদী পার হয়ে যেতে পারলে তুমি যে আমাকে বন্দুকটা দেবে তার নিশ্চয়তা কী? '

'নিশ্চয়তা থাকবে। নদীতে নামার আগে আমি রাইফেল আর কার্তুজগুলো তীরের একটা পাথরের ওপর রেখে যাবো; নানিয়াকে বলবো,

গরুবাছুরগুলো তাড়িয়ে ওপারে রেখে আবার ফিরে এসে ওগুলো নিয়ে যাবো আমি।'

'বেশ ভালো কথা, শাদা মানুষ; তোমার কথামতোই কাজ করবো আমি।'

ষড়যন্ত্র পাকাপাকি হয়ে গেল, খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর দুই ষড়যন্ত্রী হাতে হাত মিলিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলো।

'সবকিছু ঠিকঠাকমতোই কাজ করবে আশা করা যায়,' নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে পানির ওপর গা ভাসিয়ে দিয়ে হ্যাডেন ভাবলো। 'তবে কেন যেন আমাদের এই দোস্ত মাপুতাকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। নাহুন আর তার শ্রদ্ধেয় মামাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে নিজের ওপর নির্ভর করতে পারলে ভালো হতো – পানিতে নামার পর দুটো গুলি ছুঁড়লেই সারা হয়ে যেতো কাজটা। তবে কিনা সেটা হতো খুন, আর খুন জিনিসটা অপীতিকর। অন্যদিকে এটা হচ্ছে দু'জন ঘৃণ্য পলাতককে উচিত সাজা দেবার ব্যবস্থা করা – সামরিক চরিত্রের একটা দেশে সেটা প্রশংসনীয় কাজ। তাছাড়া আমি নিজে যদি ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করি তাহলে হয়তো মেয়েটা আমার বিরুদ্ধে চলে যাবে; কিন্তু উমগোনা আর নাহুন যদি মাপুতার হাতে মারা পড়ে, তাহলে আমার সঙ্গ না নিয়ে মেয়েটার উপায় থাকবে না। ঝুঁকি একটু আছে অবশ্য, কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাবধানী লোকদেরও মাঝেমধ্যে ঝুঁকি নিতে হয়।'

সহকুচক্রী মাপুতা সম্পর্কে ফিলিপ হ্যাডেনের সন্দেহ দৈবক্রমে নির্ভুল প্রমাণিত হলো। গুণধর সেই সর্দার এমনকি নিজের ক্রালে পৌঁছবার আগেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, শাদা মানুষটার পরিকল্পনা কোন কোন দিক থেকে আকর্ষণীয় মনে হলেও খুবই বিপজ্জনক। কারণ নানিয়া মেয়েটা যদি পালিয়ে যায়, রাজা নির্ঘাত রুষ্ট হবেন। তাছাড়া গিরিপথে খুনের কাজ সারতে যেসব লোকজন সে সঙ্গে নিয়ে যাবে, তারা কিছু একটা গোলমাল আছে বলে সন্দেহ করবে এবং মুখ খুলবে। অন্যদিকে, ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিলে মহামান্য রাজার গভীর আস্থা সে অর্জন করতে পারবে। রাজাকে সে বলবে, উমগোনা ও নাহুন শাদা শিকারীকে বাধ্য করেছে ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে এবং তার মুখ থেকেই সে সবকিছু জানতে পেরেছে। আর শিকারীর লোভনীয় রাইফেলটা শেষ পর্যন্ত তারই হস্তগত হবে বলে তার একান্ত বিশ্বাস আছে।

* * *

এক ঘণ্টা পরে সীমান্তের রক্ষক সর্দার মাপুতা-র কাছ থেকে সংবাদ বয়ে নিয়ে দু'জন সতর্ক দূত প্রান্তর পেরিয়ে ছুটে চললো উলুনডিতে 'অতিকায় কৃষ্ণহস্তী'র কাছে।

পাঁচ

ভাগ্য আশ্চর্যজনকভাবে নাহুন ও নানিয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুকূল হয়ে উঠলো।

জুলু সেনাপতি নাহুনের একটা বড়ো দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল, কী করে নিজের সঙ্গীদের সন্দেহের উদ্রেক না করে তাদের সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি দেবে। নাহুনের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও রাজা বেশ করে বলে দিয়েছেন শিকারের ব্যাপারে হ্যাডেনকে সাহায্য করতে এবং সে যেন পালিয়ে যেতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে। কিন্তু ঘটনাক্রমে মাপুতার শাসাতে আসার ঘটনার পরদিনই একজন দূত এসে হাজির হলো – যে-সে লোকের কাছ থেকে নয়, মহাপরাক্রমশালী সামরিক ইনদুনা ত্‌ভিংওয়েইয়ো কা মারোলো-র কাছ থেকে, যিনি পরে ইসান্দহ্লোয়ানায় জুলু সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি নির্দেশ পাঠিয়েছেন, এখানকার সবাইকে তাদের নিজ সেনাদল উমসিট্‌য়্যু বাহিনীতে ফিরে যেতে হবে, কারণ যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত অবস্থায় রাখতে হবে ওই সেনাবাহিনীকে। নির্দেশ অনুযায়ী নাহুন সবাইকে পাঠিয়ে দিলো। সেইসঙ্গে বলে পাঠালো, সে নিজে কালো মনকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক দিন পরে রওনা হবে, কারণ শাদা মানুষটার জখমগুলো এখনও যথেষ্ট ভালোভাবে সেরে ওঠেনি বলে সে দ্রুত দূরের পথ পাড়ি দিতে পারবে না। সৈন্যরা চলে গেল, সন্দেহ করলো না কিছুই।

এরপর উমগোনা রটিয়ে দিলো যে রাজার নির্দেশ পালনের জন্য সে অচিরেই উলুনডি যাত্রা করবে, তার মেয়ে নানিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাবে রাজ-অন্তঃপুর সিগদ্‌হ্লায় সম্প্রদান করে আসবার জন্যে; তাছাড়া নানিয়ার সঙ্গে তার আসন্ন বিয়ের কথা ভেবে নাহুন যে পনেরোটি গরু উপঢৌকন দিয়েছিল সেগুলোও নিয়ে যাবে, কারণ সেগুলো নাহুনকে জরিমানা করেছেন সেটিওয়েইয়ো। চরানোর জায়গা বদলের অজুহাতে উমগোনা বাকি গরুবাছুরগুলো বাসুতো-র আরেকজনের গরুর পালের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলো – যে তাদের পরিকল্পনার কথা কিছুই জানে না। লোকটাকে সে বলে দিলো, গরুবাছুরগুলো যেন ক্রোকোডাইল ড্রিফ্‌টের পাশে রাখে, কারণ সেখানকার ঘাস বেশ তাজা আর মিষ্টি।

সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হলে তৃতীয় দিনে উমগোনার দল যাত্রা করলো, সোজা উলুনডির দিকে। তবে কয়েক মাইল যাওয়ার পরই রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়লো সবাই। ডানদিকে সোজা মোড় নিয়ে সবার অলক্ষ্যে ঝোপজঙ্গলে ছাওয়া জনবসতিহীন একটা বিস্তীর্ণ এলাকা পার হয়ে গেল। তাদের পথ থেকে এখন 'মৃত্যুগহ্বর' বেশি দূরে নয় – জায়গাটা আসলে উমগোনার ক্রালের কাছেই; দূরে নয় 'প্রেতনিবাস' নামের বনও। তবে সেসব এখান থেকে কিছুই চোখে পড়ছে না।

তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে সারা রাত হেঁটে পরদিন সকালে ক্রোকোডাইল ড্রিফ্‌টের কাছে অসমতল এলাকায় পৌঁছনো। সেখানে সারা দিন এবং পরের রাত লুকিয়ে থাকবে। তারপর আগে এসে পৌঁছনো গরুবাছুরগুলো প্রথমে সংগ্রহ করে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করতেই নদী পার হয়ে নাটালে পালিয়ে যাবে। অন্তত অন্য সবার পরিকল্পনা এ-রকমই; শুধু হ্যাডেনের আছে অন্য মতলব – তার হিসেব অনুযায়ী দলের দু'জনকে শেষ একবার দেখা যাবে, তারপর আর তাদের কোন ভূমিকা থাকবে না।

পুরো এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি চেনে উমগোনা, দীর্ঘ সেই অপরাহ্নের যাত্রায় সে সবার আগে হেঁটে চলেছে পনেরোটি গরু তাড়িয়ে নিয়ে, তার হাতে শাদা-কালো *উমজিমবীট* কাঠের একটা লম্বা ছড়ি। যাত্রার শেষপ্রান্তে পৌঁছবার জন্যে বৃদ্ধ আসলে অধীর হয়ে আছে। তার পেছনে চলেছে নাহুন, হাতে অস্ত্র – চওড়া একটা অ্যাসেগাই। তবে মুচা এবং বেবুনের দাঁতের একটা মালা ছাড়া তার সারা দেহে আর কিছু নেই। নাহুনের সঙ্গে হাঁটছে নানিয়া, গায়ে তার পুঁতি-সজ্জিত সেই শাদা আঙরাখা। সবার পেছনে হ্যাডেন। সে লক্ষ করছে, আসন্ন কোন বিপদাশঙ্কা যেন মেয়েটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মাঝে মাঝে প্রেমিকের বাহু আঁকড়ে ধরছে সে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল স্বরে ডাকছে – প্রবল আবেগের সঙ্গেই বলা চলে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, দৃশ্যটা হ্যাডেনের মর্মস্পর্শ করলো। যে মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে সেটার পেছনে নিজের ভূমিকার কথা ভেবে দু-একবার সে এমন তীব্র বিবেকের দংশন অনুভব করলো যে, মৃত্যুর যে-জাল সে নিজে বুনেছে তা গুটিয়ে নেবার কোন উপায় আছে কিনা তা মনে মনে খুঁজে ফিরতে লাগলো। কিন্তু সেই পিশাচকণ্ঠ কানে কানে তাকে মন্ত্রণা দিয়ে চলেছে অবিরাম। সেই কণ্ঠ তাকে মনে করিয়ে দিলো, সে, শ্বেতাঙ্গ *ইনকুস*, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এই আঁধারবরণ সুন্দরীর কাছে; এবং নাহুনকে রক্ষা করার কোন উপায় যদি সে বের করতে পারে তাহলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নানিয়া তার পাশের ওই জংলী ভদ্রলোকের স্ত্রীতে পরিণত হবে – যে-লোক তার নাম দিয়েছে 'কালো মন', যে তাকে ঘৃণার চোখে দেখে, যে-লোককে সে খুন করবে ভেবেছিল এবং বিনিময়ে অবিলম্বে সেই বিশ্বাসঘাতকতার জবাব যে দিয়েছিল নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে চিতাবাঘের কবল থেকে উদ্ধার করে। তাছাড়া, হ্যাডেনের অস্তিত্বের একটি বিধান হচ্ছে, তার অর্জনক্ষমতার মধ্যে রয়েছে এমন কোনকিছুর জন্যে তার বাসনা হলে তা থেকে নিজেকে কখনও বঞ্চিত না করা – যে বিধান তাকে সবসময় টেনে নিয়ে গেছে গভীরতর পাপের পথে। অন্যসব ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা তাকে বেশি দূর নিয়ে যায়নি, কারণ অতীতে সে চেয়েছে অনেক, পেয়েছে অল্প; কিন্তু এবারের এই ফুলটি রয়েছে তার হাতের নাগালেই, সেটা সে ছিঁড়ে নেবেই। নাহুন যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার ও ওই ফুলের মাঝখানে, নাহুনের ভাগ্যে আছে দুর্ভোগ। আর সে-ফুল যদি তার হাতের ছোঁয়ায় শুকিয়ে যায়, তবে তা ফুলেরই দুর্ভাগ্য – সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া যাবে সহজেই। মাঝেমধ্যে বিবেকের যেটুকু দংশন হ্যাডেন অনুভব করছিল তা সে এভাবেই

অগ্রাহ্য করে পিশাচকণ্ঠের গোপন মন্ত্রণার বশ হয়ে গেল – এবং তার জীবনে এরকম এই প্রথম ঘটলো না।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে চারজন একটা নদী পেরিয়ে গেল, এ-নদীই মাইলখানেক সামনে গিরিচূড়ার ওপর থেকে মৃত্যুগহ্বরের ভেতর গিয়ে পড়েছে। অন্য পাড়ে উঠে কাঁটাগাছের একটা ছোট জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতেই তারা সোজা গিয়ে পড়লো দু'কুড়ি দু'জন সেপাইয়ের মধ্যে – যারা এতক্ষণ নস্যি নিয়ে আর *ডাক্কা* নামের দেশী গাঁজা টেনে দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি ভুলতে চেষ্টা করছিল। সৈন্যদের সঙ্গে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বসে অপেক্ষা করছিল সর্দার মাপুতা – মোটা শরীর নিয়ে তার পক্ষে হাঁটা দুঃসাধ্য।

যাদের অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ, সেই অতিথিরা পৌঁছে গেছে দেখে সেপাইরা ডাক্কার পাইপ ঝেড়ে ফেললো, নস্যির কৌটো আবার গুঁজে রাখলো কানের লতিতে কাটা খাঁজের ভেতর, তারপর পাকড়াও করলো চারজনকে।

'এসবের অর্থ কী, ওহে রাজার সৈনিকেরা?' কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলো উমগোনা। 'উ'সেটিওয়েইয়ো-র ক্রালের পথে যাত্রা করেছি আমরা; কেন আমাদের ওপর জুলুম করছো?'

'তা বটে,' আমুদে চেহারার দলনেতা কর্কশ হাসি হেসে জবাব দিলো। 'দক্ষিণমুখো চলেছো কেন তাহলে শুনি? কালো প্রভু কি দক্ষিণে থাকেন? বেশ তো, আরেক ক্রালের দিকে যাত্রা করবে তোমরা এখনই।'

'এসব আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' উমগোনা তোতলাতে তোতলাতে বললো।

'বুঝিয়ে বলছি তাহলে আমি, দম নিতে নিতে শোনো,' দলপতি বললো। 'ওই যে সর্দার মাপুতাকে দেখছো, সে উলুনডিতে কালো প্রভুর কাছে সংবাদ পাঠিয়েছে যে সে জানতে পেরেছে তোমরা নাটালে পালিয়ে যাবার মতলব করছো – তাকে খবরটা জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে এই শাদা লোক। কালো প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছেন, আমাদের পাঠিয়েছেন তোমাদের পাকড়াও করে খতম করার জন্যে। এই হচ্ছে ঘটনা। এবার চলো, চুপচাপ এগোও, কাজটা চুকিয়ে ফেলি। মৃত্যুগহ্বর কাছেই, সহজ হবে তোমাদের পরপারযাত্রা।'

নাহুন শুনলো কথাগুলো, পরমুহূর্তে সোজা এক লাফে হ্যাডেনের গলা টিপে ধরতে গেল। কিন্তু জায়গামতো পৌঁছতে পারলো না, কারণ সেপাইরা চেপে ধরলো তাকে। নানিয়াও কথাগুলো শুনেছে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকের চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো সে; কিছুই বললো না, কেবল তাকিয়ে রইল, কিন্তু তার সে-দৃষ্টি হ্যাডেনের পক্ষে কখনও ভোলার নয়।

হ্যাডেনের নিজের মধ্যে ফুঁসে উঠলো মাপুতার প্রতি তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধ। 'বদমাশ জানোয়ার!' দাঁতে দাঁত চেপে বললো সে।

সর্দার ফ্যাকাসে ধরনের হাসি হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

নদীর তীর ধরে ওদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো। মৃত্যুগহ্বরে গিয়ে পড়েছে যে জলপ্রপাত তার কাছে এসে পড়লো সবাই।

জীবনের নিজস্ব বৃত্তে হ্যাডেন সাহসী লোক। কিন্তু সেই অতল গহ্বরের দিকে তাকিয়ে তার বুক কেঁপে উঠলো।

'আমাকে ওখানে ছুঁড়ে ফেলতে চাইছো নাকি তোমরা?' গম্ভীর গলায় জুলু দলপতিকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'তোমাকে, শাদা মানুষ?' সৈনিক বললো নির্বিকারভাবে। 'না, আমাদের ওপর নির্দেশ আছে তোমাকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে হবে – তবে তিনি তোমাকে নিয়ে কী করবেন তা আমি জানি না। তোমাদের লোকদের সঙ্গে আমাদের লোকদের যুদ্ধ বাধবে শুনেছি, কাজেই রাজা হয়তো তোমাকে পিষে ওষুধ বানাতে চান ওঝাদের ব্যবহারের জন্যে, কিংবা অন্য শাদা লোকদের সাবধান করে দেবার জন্যে তোমাকে উইঢিপির গায়ে গোঁজ ঠুকে লটকে রাখতে চান।'

কথাগুলো নীরবে শুনলো হ্যাডেন, কিন্তু তার মগজের ওপর প্রতিক্রিয়া হলো সাংঘাতিক প্রবল। তৎক্ষণাৎ সে পালানোর কোন একটা উপায় খুঁজতে শুরু করে দিলো।

এর মধ্যে দলটা মৃত্যুগহ্বরের পানির ওপর ঝুঁকে থাকা মিমোজা গাছদুটোর কাছে এসে থেমে দাঁড়িয়েছে।

'কে আগে ঝাঁপ দেবে?' দলপতি জানতে চাইলো সর্দার মাপুতার কাছে।

'বুড়ো জাদুকর,' মাথা ঝাঁকিয়ে উমগোনাকে দেখিয়ে উত্তর দিলো সর্দার। 'ওর পরে ওর মেয়ে, আর সবশেষে এই ছোকরা,' বলেই সে খোলা হাতে নাহুনের মুখে ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিলো।

'এসে পড়ো, জাদুকর,' উমগোনার বাহু খামচে ধরে বলে উঠলো দলপতি, 'দেখি কেমন সাঁতার কাটতে পারো তুমি।'

চরম বিপর্যয়সূচক কথাগুলো কানে যেতে উমগোনা যেন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলো তার জাতির স্বভাবধর্ম অনুযায়ী।

'আমাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে না, সৈনিক,' ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো সে, 'বুড়ো হয়েছি আমি, মরণের জন্যে তৈরী আছি।' পাশে দাঁড়ানো মেয়েকে চুমু খেলো সে, নাহুনের হাত জড়িয়ে ধরে ঝাঁকালো। হ্যাডেনের দিক থেকে ঘৃণার ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে মিমোজা গাছদুটোর গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়ালো। অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। তারপর একটুও শব্দ না করে আচমকা নিচের গভীর গহ্বরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'বাহাদুর বটে,' দলপতি বলে উঠলো প্রশংসার সুরে। 'তুমিও ঝাঁপ দিতে পারবে কি, খুকি? নাকি ধরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে?'

'আমার বাবা যে-পথে গেছে আমিও সে-পথে যেতে পারবো,' নানিয়া ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলো। 'তবে তার আগে একটা কথা বলার সুযোগ চাইছি। এ-

কথা সত্যি যে আমরা রাজার নাগাল থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং সেজন্যে আইন অনুযায়ী আমাদের মরতেই হবে। কিন্তু পালাবার পরিকল্পনাটা করেছিল এই কালো মন, এবং সে-ই আবার আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শুনবে? কারণ সে আমার প্রেমভিক্ষা করেছিল, এবং তাকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আর এই হচ্ছে তার প্রতিশোধ – শাদা মানুষের প্রতিশোধ।'

'তাহলে এই ব্যাপার!' বলে উঠলো সর্দার মাপুতা, 'সত্যি কথাই বলছে এই সুন্দরী, কারণ শাদা লোকটা আমার সঙ্গে এরকম একটা চুক্তি করতে চায় যে ক্রোকোডাইল ড্রিফ্‌টে জাদুকর উমগোনা আর সৈনিক নাহুনকে শেষ করে দেয়া হবে, আর সে নিজে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাবে। আমি নরম সুরে কথা বলে তার প্রস্তাবে সায় দিই, আর তারপর অনুগত একজন প্রজা হিসেবে রাজাকে সব জানাবার ব্যবস্থা করি।'

'শুনলে তো,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো নানিয়া। 'নাহুন, বিদায় দাও – অবশ্য শিগ্‌গিরই হয়তো আবার আমরা এক হবো। তোমার কর্তব্যপথ থেকে আমিই তোমাকে প্রলোভন দেখিয়ে সরিয়ে এনেছিলাম। আমারই জন্য তুমি তোমার মর্যাদা বিসর্জন দিয়েছো। তার ফল আমি পেয়েছি। বিদায়, স্বামী, রাজার নারীদের ঘরে ঠাঁই নেবার চেয়ে তোমার সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া ভালো,' বলে নানিয়া পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়ালো।

সেখানে একটা মিমোজা গাছের শাখা হাত দিয়ে ধরে ঘুরে দাঁড়ালো সে। হ্যাডেনের উদ্দেশে বললো:

'কালো মন, মনে হচ্ছে তোমারই জিত হলো আজ। তবে অন্তত আমাকে তুমি পাওনি। আর – সূর্য অস্ত যায়নি এখনও। সূর্য ডুবে গেলে রাত আসে, কালো মন, এবং আমি প্রার্থনা করি সেই রাতের আঁধারে তুমি অনন্তকাল ঘুরে মরো; তোমাকে পান করতে দেয়া হোক আমার রক্ত, আমার বাবা উমগোনার রক্ত, এবং আমার স্বামী নাহুনের রক্ত – যে তোমার জীবন বাঁচিয়েছে, আর যাকে তুমি হত্যা করেছো। কে জানে, কালো মন, আবার হয়তো দেখা হবে আমাদের ওইখানে – প্রেতনিবাসে।'

ক্ষীণ একটা কাতরোক্তি করে নানিয়া দু'হাত একত্র করলো। তারপর লাফিয়ে উঠে পাটাতন ছেড়ে সামনের দিকে ঝাঁপ দিলো। দর্শকেরা মাথা ঝুঁকিয়ে সামনে তাকালো। দেখতে পেলো, মাথা নিচের দিকে দিয়ে তীব্র গতিতে জলপ্রপাত বরাবর নেমে যাচ্ছে নানিয়ার দেহ, পঞ্চাশ ফুট নিচে পানির ভেতরে গিয়ে আছড়ে পড়লো। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপর শেষবারের মতো অন্ধকার জলাশয়ের ওপর নানিয়ার শাদা পোশাকের আভাস চোখে পড়লো ওদের। তারপরই অন্ধকার আর কুয়াশার কুণ্ডলীর আড়ালে তা ঢাকা পড়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেছে নানিয়া।

'এবার, স্বামী,' দলপতির উৎফুল্ল গলা শোনা গেল, 'ওই যে ওখানে তোমার ফুলশয্যা, কাজেই তাড়াতাড়ি বধূকে অনুসরণ করো, সে যখন এমন

আগ্রহের সাথে আগে আগে রওনা হয়ে গেল! আহা, মারবার জন্যে ভারী সুবিধের লোক তোমরা; এমন কাউকে কখনও আমি হাতে পাইনি যে এর চেয়ে কম ঝামেলা করেছে। তোমরা –' বলতে বলতে থমকে গিয়ে নির্বাক হয়ে গেল সে। সুতীব্র মানসিক যন্ত্রণার মারাত্মক এক পরিণতি ঘটেছে – তার চোখের সামনে হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেছে নাহুন।

সিংহের মতো গর্জন ছেড়ে প্রকাণ্ড মানুষটা তাকে ধরে থাকা লোকগুলোকে এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে দিলো। তারপর তাদের একজনের কোমর আর উরু বেষ্টন করে চেপে ধরলো নিজের ভয়ানক শক্তির সবটুকু দিয়ে। শিশুর মতো শূন্যে তুলে ফেললো তাকে, তারপর পাথুরে কিনারার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো নিচে মৃত্যুগহ্বরের প্রস্তরময় তলদেশে মৃত্যুর ঠিকানায়।

'কালো মন! তোমার পালা, বিশ্বাসঘাতক কালো মন!' বলতে বলতে হ্যাডেনের দিকে তেড়ে গেল নাহুন। তার চোখদুটো ঘুরছে, ফেনা ছুটছে ঠোঁট থেকে। সর্দার মাপুতার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে হাত দিয়ে পেছনে ঘুসি ছুঁড়ে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিলো। ধরতে পারলে হ্যাডেনের অবস্থা শোচনীয় করে তুলতো নাহুন। কিন্তু তার নাগাল পেলো না সে, কারণ সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর, ভয়ানক ধস্তাধস্তি সত্ত্বেও তাকে টেনে শুইয়ে ফেললো মাটিতে – যেমন করে কোন কোন উৎসবে রাজার উপস্থিতিতে জুলু সৈনিকের দল খালি হাতে ষাঁড় পাকড়ে ধরে শুইয়ে ফেলে।

'আর কোন বজ্জাতি করার আগেই ছুঁড়ে ফেলে দাও ওকে নিচে,' কেউ একজন বলে উঠলো।

'না, না!' চেঁচিয়ে বললো দলপতি, 'ও এখন পবিত্র পুণ্যাত্মা; স্বর্গের আগুন এসে পড়েছে ওর মাথায়, ওর কোন ক্ষতি করা যাবে না, তাহলে আমাদের সবার সাংঘাতিক অনিষ্ট হবে। হাত-পা বেঁধে ফেলো, তারপর সাবধানে ধরে এখান থেকে এমন কোন জায়গায় বয়ে নিয়ে চলো যেখানে ওর শুশ্রূষা করা যায়। তখনই আমি ভেবেছিলাম এই কুকর্মার দল বড্ড কম যন্ত্রণা দিচ্ছে – কেন, সেটা এখন স্পষ্ট হয়ে গেল।'

কাজেই সবাই মিলে নাহুনের হাত ও কবজি বাঁধতে লেগে গেল। যতটা সম্ভব কম জোর খাটিয়ে কাজটা করছে তারা, কারণ জুলুদের মধ্যে উন্মাদ লোককে পবিত্রাত্মা বলে গণ্য করা হয়। সহজ হলো না কাজটা, যথেষ্ট সময় লাগলো।

চারদিকে তাকিয়ে হ্যাডেন দেখলো, এ-ই সুযোগ। তার পাশে বেশ কাছেই মাটিতে রাখা তার রাইফেলটা – একজন সৈন্য সেটা ওখানে নামিয়ে রেখেছে। ওদিকে দশ-বারো গজ দূরে মাপুতার টাট্টুঘোড়া ঘাস খাচ্ছে। ছোঁ মেরে মার্টিনিটা হাতে তুলে নিলো সে, পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে, তীরবেগে ছুটে চললো ক্রোকোডাইল ড্রিফ্‌টের দিকে। এই সুনিপুণ পলায়নকর্ম এমন আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সম্পাদন করলো সে যে নাহুনকে বাঁধতে ব্যস্ত সৈন্যদের কেউই আধ মিনিট বা তারও বেশি সময় লক্ষই করলো না কী ঘটে গেছে। তারপর মাপুতার চোখে পড়লো ব্যাপারটা, পরক্ষণে

সে ঢাল বেয়ে থপ্‌থপ্‌ করে হেলেদুলে ছুটতে শুরু করলো হ্যাডেনের পিছু ধাওয়া করে।

'শাদা চোর!' চেঁচাচ্ছে সর্দার,'আমার ঘোড়া চুরি করেছে; বন্দুকটাও নিয়ে গেছে – ওটা আমাকে দেবে বলে কথা দিয়েছিল।'

হ্যাডেন ততক্ষণে শ'খানেক গজ এগিয়ে গেছে। মাপুতার কথা পরিষ্কার শুনতে পেলো সে, তার ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এই লোক তাকে প্রকাশ্যে খুনী প্রতিপন্ন করেছে; তাছাড়া যার কারণে সে এতসব অপকর্মে হাত ডুবিয়েছে সেই মেয়েটাও হাতছাড়া হয়ে গেছে এরই জন্যে। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো সে – এখনও ছুটে আসছে মাপুতা, একা। হ্যাঁ, সময় আছে হাতে। যাই ঘটুক, ঝুঁকিটা নেবে সে।

আচমকা ঘোড়া থামিয়ে সেটার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো হ্যাডেন, প্রায় একই সঙ্গে লাগামের ভেতর দিয়ে বাহু গলিয়ে দিলো। দেখলো, যা আশা করেছিল তা-ই, প্রশিক্ষণ পাওয়া শিকারের ঘোড়া, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাটিতে শক্ত করে পা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে গভীর একটা শ্বাস নিলো হ্যাডেন। রাইফেল কক্‌ করে অগ্রসরমান সর্দারের ওপর লক্ষ্য স্থির করলো।

এবার মাপুতা তার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে, ভয়ে আর্তনাদ করে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাতে শুরু করলো। তার চওড়া পিঠের ওপর ভালোমতো তাক করার জন্য এক সেকেণ্ড সময় নিলো হ্যাডেন, তারপর ঠিক যে-মুহূর্তে ঢালের ওপর সৈন্যরা উদয় হলো, ট্রিগার টিপে দিলো তৎক্ষণাৎ। হাতের নিশানার জন্য খ্যাতিমান সে, এবারও তার পারদর্শিতা বিফলে গেল না। বুলেটের শব্দ কানে পৌঁছবার আগেই মাপুতা শূন্যে দু'হাত ছুঁড়ে মাটিতে আছড়ে পড়লো। মারা গেছে সে।

আরও তিন সেকেণ্ড পার হলো। বিশ্রী একটা গাল দিয়ে হ্যাডেন আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো। প্রাণপণে নদীর দিকে ছুটলো সে। কিছুক্ষণ পর নিরাপদে নদী পার হয়ে গেল।

ছয়

মৃত্যুগহ্বরের কিনারায় বাঁধা যে পাটাতনের ওপর দাঁড়ালে মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে ওঠে, সেখান থেকে নানিয়া যখন ঝাঁপিয়ে পড়লো, একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো তার ভাগ্যে। খাড়া গিরিপ্রাচীরের গা ঘেঁষে প্রচুর এবড়োখেবড়ো পাথর। জলপ্রপাতের পানির রাশি এসব শিলাখণ্ডের ওপর সগর্জনে আছড়ে পড়ে অজস্র ধারায় বিভক্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিচের গভীর জলাশয়ের বিক্ষুব্ধ বুকে। ওপর থেকে যেসব হতভাগ্যকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, এসব পাথরের ওপর আছড়ে পড়ার ফলেই তাদের দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। কিন্তু নানিয়া ওভাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকেনি। নিজে থেকে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে গিয়ে সে যেভাবে সবেগে লাফিয়ে উঠে নিচে ঝাঁপ দিয়েছে তার ফল হয়েছে এই যে, এবড়োখেবড়ো পাথরের সীমানা ছাড়িয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। খুব অল্পের জন্য সেগুলোর কিনারা এড়িয়ে সে পাকা সাঁতারুর মতো আগে মাথা নিচের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে গভীর পানিতে গিয়ে পড়লো। তারপর তলিয়ে যেতে থাকলো দ্রুত – নিচে, আরও নিচে। শেষে তার মনে হতে লাগলো আর বুঝি কখনও ওপরে উঠতেই পারবে না।

তবু ভেসে উঠলো নানিয়া – জলাশয়ের শেষ প্রান্তে, নিম্নগামী স্রোতস্বিনীর মুখে। এরপর ভেসে যেতে থাকলো দ্রুতবেগে, ধাবমান জলের ধারা তাকে বয়ে নিয়ে চললো। ভাগ্য ভালো, এদিকে পাথর নেই; আর সে দক্ষ সাঁতারু বলে তীরে গিয়ে আছড়ে পড়ার সম্ভাব্য বিপদও এড়িয়ে চলতে পারলো।

এভাবে ভাসতে ভাসতে নানিয়া অনেক দূর চলে গেল। শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলো এক বনের মধ্যে এসে পড়েছে। গাছগাছালির কারণে পানিতে আলো এসে পড়তে পারছে না, নুয়ে পড়া ডালপালা পানির ধারা ছুঁয়ে রয়েছে। হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ধরে ফেললো নানিয়া, সেটার সাহায্যে ধীরে ধীরে নিজেকে টেনে তুললো মৃত্যুনদ থেকে – যেখান থেকে আগে কেউ কখনও বেঁচে ফিরতে পারেনি। তীরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে সে; কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে, গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। এমনকি তার শাদা পোশাকও এখন পর্যন্ত গলার সঙ্গে সেঁটে রয়েছে।

কিন্তু ভয়ঙ্কর এই যাত্রায় কোন চোট না পেলেও এত ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে নানিয়া যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না বললেই চলে। রাতের আঁধারের মতো জমাট অন্ধকার এখানে। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সে অসহায়ভাবে চারদিকে তাকিয়ে কিছু একটা আশ্রয়ের খোঁজ করতে লাগলো। পানির ধার ঘেঁষে প্রকাণ্ড একটা ইয়েলো-উড গাছ দাঁড়িয়ে আছে। টলতে টলতে সেদিকেই এগিয়ে গেল

নানিয়া – ভাবছে, গাছ বেয়ে উঠে ডালপালার মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নেবে। সেখানে বুনো জীবজানোয়ারের নাগাল থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে বলে আশা করছে।

আবারও ভাগ্য তার সহায় হলো। মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে গাছের গায়ে মস্ত একটা গর্ত দেখতে পেলো সে। ভেতরটা ফাঁপা। সাপখোপ বা অন্য ক্ষতিকর জীবজন্তুর বাসা হতে পারে জেনেও ভাগ্যের ওপর ভরসা করে হামাগুড়ি দিয়ে কোটরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দেখলো ভেতরটা বেশ প্রশস্ত আর উষ্ণ। শুকনোও জায়গাটা, কারণ কোটরের তলদেশে পচা খড়কুটো আর শ্যাওলার ফুটখানেক কিংবা তারও বেশি পুরু একটা আস্তরণ রয়েছে – ইঁদুরের দল বা পাখিরা সেগুলো ওখানে এনে জমা করেছে। সেই খড়কুটোর ওপর শুয়ে পড়লো নানিয়া, শ্যাওলা আর পাতা দিয়ে শরীর ঢেকে নিলো। তারপর অচিরেই ঘুম বা এক ধরনের আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে তলিয়ে গেল।

* * *

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে নানিয়া জানে না। তবে শেষ পর্যন্ত তার ঘুম ভেঙে গেল বিচিত্র এক ধরনের শব্দ কানে আসায়। মানুষের অস্ফুট খোনা গলার মতো সে-আওয়াজ। যে-ভাষায় কথাবার্তা হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সে গাছের কোটরের ভেতর থেকে বাইরে উঁকি দিলো।

রাতের বনভূমি। তবে আকাশে ঝিক্‌মিক্ করছে অসংখ্য উজ্জ্বল তারা। নদীর কিনারার কাছেই একটা খোলা বৃত্তাকার জায়গায় তারার আলো এসে পড়েছে। বৃত্তের মাঝখানে মস্ত একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, আর আগুন থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে আট-দশটা ভয়ালদর্শন জীব। মনে হচ্ছে, মাটিতে শুইয়ে রাখা কিছু একটা নিয়ে তারা উল্লাস করছে। তাদের উচ্চতা বেশি নয়। নারী-পুরুষ দুই-ই আছে, তবে কোন শিশু নেই। সবাই প্রায় উলঙ্গ। লম্বা পাতলা চুল তাদের, সেগুলো গজিয়েছে চোখের একেবারে কাছাকাছি জায়গা থেকে। চোয়াল আর দাঁতের পাটি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। আর তাদের কালো শরীরের যা বেড়, উচ্চতার সঙ্গে তার কিছুমাত্র মিল নেই। তাদের হাতে ধরা রয়েছে লাঠি, সেগুলোর সঙ্গে ধারালো পাথরের টুকরো বাঁধা। কারও কারও হাতে আবার ওই পাথরেরই তৈরী কুড়ুল-আকৃতির এবড়োখেবড়ো ছুরি।

নানিয়ার রক্ত হিম হয়ে এলো, ভয়ে মূর্ছা যাবার উপক্রম হলো তার। কারণ সে জানে, ভূতুড়ে বনের মধ্যে রয়েছে সে এখন, এবং নিঃসন্দেহে এরা হচ্ছে *এসেমকোফু*, এ-বনের বাসিন্দা ভয়াল প্রেতাত্মার দল। হ্যাঁ, তা-ই হবে ওরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারছে না নানিয়া – দৃশ্যটা তাকে ভয়ঙ্কর এক সম্মোহনে বেঁধে রেখেছে।

কিন্তু ভূতই যদি হয়ে থাকবে ওরা, তাহলে কেন মানুষের মতো গান গাইছে আর নাচছে? ওই ধারালো পাথরগুলো নাড়ছে কেন শূন্যে উঁচিয়ে; কেন ঝগড়া করছে, ঘা মারছে একে অন্যকে? কেন অমন আগুনের কুণ্ড তৈরি করেছে –

খাবার রান্না করতে চাইলে মানুষ যেমন করে থাকে? তাছাড়া, কী নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছে ওরা, মাটির ওপর অমন চুপচাপ পড়ে থাকা লম্বা কালো বস্তুটা আসলে কী? শিকার করা কোন পশু মনে হচ্ছে না ওটাকে, কুমির হওয়ার সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে। কিন্তু কোন এক ধরনের খাদ্যবস্তু যে ওটা তা পরিষ্কার বোঝা যায়, কারণ জিনিসটা কেটে টুকরো করার জন্যে ওরা পাথরের ছুরি শান দিচ্ছে।

এরকম চিন্তা-ভাবনা করছে নানিয়া, এমন সময় ভয়ালদর্শন খুদে জীবগুলোর মধ্য থেকে একজন আগুনের দিকে এগিয়ে গেল। অগ্নিকুণ্ডের ভেতর থেকে একটা জ্বলন্ত ডাল তুলে নিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা জিনিসটার ওপর উঁচু করে ধরলো – তার এক সঙ্গী পাথরের ছুরি দিয়ে কিছু একটা করতে যাচ্ছে জিনিসটাকে, সে তাই আলো উঁচিয়ে সাহায্য করছে। সঙ্গে সঙ্গে নানিয়া মাথা টেনে নিলো গাছের কোটরের মধ্যে, তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার গলা চিরে বেরোবার আগেই চাপা দিয়ে ফেললো। কী ওটা এবার দেখতে পেয়েছে সে – একজন মানুষের দেহ। হ্যাঁ, এবং প্রেতাত্মা নয় ওগুলো – ওগুলো নরমাংসভুক মানুষ, ছোটবেলায় সে যাতে বাড়ি ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে দূরে চলে না যায় সেজন্যে ভয় দেখাতে মা তাকে এসব মানুষখেকোদের গল্প শুনিয়েছে।

কিন্তু যে-লোকটাকে উদরসাৎ করতে চলেছে ওরা, কে সে? ওদের নিজেদের কেউ ওটা হতে পারে না, কারণ লম্বায় অনেক বেশি লোকটা। হঠাৎ আঁতকে উঠলো নানিয়া – বুঝতে পেরেছে এবার, নিশ্চয় ওটা নাহুন! ওই ওদিকে ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলার পর প্রাণ হারিয়েছে সে, তারপর পানির স্রোত তার মৃতদেহ ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে ভূতুড়ে জঙ্গলে, যেমন সে নিজে ভেসে এসেছে জীবন্ত অবস্থায়। হ্যাঁ, নিশ্চয় নাহুনই হবে ওটা, এবং এখন তাহলে দেখতে হবে কীভাবে তার চোখের সামনে তার স্বামীকে ছিঁড়েখুঁড়ে সাবাড় করা হয়।

কথাটা ভাবতেই অস্থির হয়ে উঠলো নানিয়া। রাজার আদেশে প্রাণ দিতে হয়েছে নাহুনকে, সেটা না হয় স্বাভাবিক; তাই বলে তার শেষ পরিণতি হবে এই! কিন্তু নানিয়া কী করতে পারে তা ঠেকানোর জন্যে?

হ্যাঁ, যদি তাকে জীবনও দিতে হয় তবু উচিত হবে বাধা দেয়া। সবচেয়ে খারাপ যা ঘটতে পারে তা হলো, মানুষখেকোর দল তাকেও মেরে ফেলে খেয়ে নিতে পারে। নাহুন চলে গেছে, তার বাবা চলে গেছে, তাছাড়া কোনরকম ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক আশা-সংশয়ও তাকে পীড়িত করে না; কাজেই নিজের প্রাণবায়ু ধরে রাখার জন্যে খুব বেশি চিন্তিত সে নয়।

গাছের কোটর ছেড়ে বেরিয়ে নানিয়া নিঃশব্দে মানুষখেকোদের দিকে হেঁটে চললো – ওদের কাছে পৌঁছে কী করবে সে সম্পর্কে কিছুই ভাবেনি। অগ্নিকুণ্ড বরাবর পৌঁছতেই এই পরিকল্পনাহীনতার বিষয়টা তার মনে প্রবল আলোড়ন তুললো। থেমে দাঁড়ালো সে চিন্তা করার জন্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মানুষখেকোদের একজন মুখ তুলে তাকালো। দেখতে পেলো, সামনে শাদা কাপড়ে মোড়া এক দীর্ঘ রাজসিক মূর্তি – আগুনের কম্পমান

শিখার আলোয় মনে হচ্ছে, সে-মূর্তি একবার পেছনের ঘন অন্ধকার ছেড়ে এগিয়ে আসছে, আবার পিছিয়ে গিয়ে মিশে যাচ্ছে অন্ধকারে। নানিয়াকে দেখতে পাবার মুহূর্তে হতভাগা জংলী বেচারার দাঁতের ফাঁকে একটা পাথরের ছুরি কামড়ে ধরে রাখা ছিল, কিন্তু সেটা ওভাবে বেশিক্ষণ রইল না। কারণ প্রকাণ্ড চোয়ালদুটো হাঁ করে সে এমন এক আতঙ্কিত তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো যেমন চিৎকার নানিয়া কোনদিন শোনেনি।

পরমুহূর্তে অন্যরাও দেখতে পেলো নানিয়াকে, আর তারপরই ভয়ার্ত চিৎকার-চেঁচামেচিতে জঙ্গল মুখর হয়ে উঠলো। বনবাসী নির্বাসিতের দল নানিয়ার দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ভীত-সন্ত্রস্ত শেয়ালের পালের মতো ঝোপঝাড় ভেদ করে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। জুলুদের বিশ্বাসের অন্তর্গত যে *এসেমকোফু*, তারা নিজেদের ভূতুড়ে নিবাসে তাদেরই কল্পনার ভূতের কাছে পর্যুদস্ত হলো।

হতভাগ্য এসেমকোফু! তারা আসলে অসহায় উপবাসী জংলী মানুষ – বহু বছর আগে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে এই অলক্ষুণে জায়গায়, পোড়া দেহে প্রাণ ধরে রাখতে সামনে যে একটিমাত্র উপায় ছিল তা-ই তারা অবলম্বন করেছে। এখানে অন্তত তাদের নির্যাতিত হতে হয় না, আর বৃক্ষময় এই গভীর অরণ্যে অন্য খাবার যেহেতু সামান্যই পাওয়া যায়, নদীতে যা ভেসে আসে তা দিয়েই তারা ক্ষুধানিবৃত্তি করে। মৃত্যুগহ্বরে প্রাণবধের সংখ্যা যখন কম হয়, সত্যি ভারী কঠিন সময় যায় তাদের – কারণ তখন একজন আরেকজনকে ধরে খেতে বাধ্য হয় তারা। সেজন্যেই ওদের কোন ছেলেমেয়ে নেই।

জংলীদের অস্ফুট কোলাহল দূরে মিলিয়ে গেলে নানিয়া মাটিতে শায়িত দেহটা দেখার জন্যে ছুটে গেল সামনে। তারপর স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে টলতে টলতে পিছিয়ে এলো। নাহুন নয়। তবে মুখ দেখে চিনতে পেরেছে লোকটাকে – জল্লাদের দলের একজন। এখানে কী করে এলো সে? নাহুন ওকে খুন করেছে নাকি? নাহুন কি পালিয়েছে? বলতে পারে না নানিয়া, এবং যাই ঘটুক ব্যাপারটা ঠিক সম্ভাব্য বলে মনে হয় না। কিন্তু তবু এই মৃত সৈনিককে দেখে তার মনে ক্ষীণ একটা আশার আলো জ্বলে উঠেছে – কারণ নাহুনের কোন হাত যদি এই মৃত্যুতে না থেকে থাকবে তাহলে লোকটা মারা গেল কীভাবে?

যাই হোক, নিজের গুপ্ত আশ্রয়ের এত কাছে মৃতদেহটা পড়ে থাকতে দেয়া তার কাছে অসহনীয় মনে হলো। সেজন্যে প্রচুর শ্রমস্বীকার করে লাশটাকে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আবার পানিতে ফেলে দিলো, স্রোত সেটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল দ্রুত। এরপর নানিয়া প্রথমে অগ্নিকুণ্ডটা আরও ভালো করে জ্বেলে দিয়ে গাছের কোটরে ফিরে গেল। অপেক্ষা করতে লাগলো কখন আলো ফুটবে।

অবশেষে দেখা মিললো আলোর – যেটুকু আজ পর্যন্ত চুঁইয়ে আসতে পেরেছে এই অন্ধকার গুহায়। খিদে পেয়েছে বুঝতে পেরে নানিয়া গাছ থেকে নেমে খাবার খুঁজতে বেরোলো। সারা দিন খুঁজলো সে। কিছুই পেলো না।

শেষে সূর্যাস্তের দিকে তার একটা কথা মনে পড়ে গেল। বনের শেষপ্রান্তে এক জায়গায় একখানা সমতল পাথরখণ্ড আছে। কারও কোন বিপদাপদ ঘটে যদি, কিংবা কেউ যদি মনে করে তার নিজের বা তার সহায়সম্পত্তির ওপর জাদু করেছে কেউ, তাহলে সে প্রথামতো ওই পাথরের ওপর ভোগ হিসেবে খাবারদাবার রেখে যায়। লোকের ধারণা, সেগুলো দিয়ে *এসেমকোফু* আর *আমাহ্রোসি* তাদের আত্মিক ক্ষুধা মেটায়। উপবাসের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে দ্রুতপায়ে জায়গাটার দিকে যাত্রা করলো নানিয়া।

সেখানে পৌঁছে খুশি হয়ে উঠলো সে – আশেপাশের কোন ক্রালে সম্প্রতি কোন বিপদাপদ ঘটেছে বোঝা যাচ্ছে, ভোগদানের পাথরের ওপরটা ছেয়ে আছে খাবারদাবারে। ভুট্টার মোচা আছে, অনেকগুলো লাউয়ের খোলভর্তি দুধ আছে, আছে পরিজ, এমনকি মাংসও।

যতোটা বইতে পারলো সঙ্গে নিয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে এলো নানিয়া। দুধ পান করলো, আগুন জ্বেলে রান্না করলো মাংস এবং ভুট্টার দানা। তারপর আবার হামাগুড়ি দিয়ে গাছের কোটরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লো।

* * *

প্রায় দু'মাস এভাবে জঙ্গলে কাটিয়ে দিলো নানিয়া। বন ছেড়ে বেরোতে সাহস করেনি সে – মনে ভয়, যদি ধরা পড়ে আবার, যদি দ্বিতীয়বারের মতো রাজার বিচারের শিকার হতে হয়। জঙ্গলের ভেতর নিরাপদ আছে সে অন্তত, কারণ কেউ এখানে ঢুকতে সাহস করবে না, এসেমকোফুরাও আর কোন সমস্যা করেনি। দু-একবার তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছে অবশ্য, কিন্তু প্রতিবারই আর্তনাদ করতে করতে তারা ছুটে পালিয়ে গেছে ওর ত্রিসীমানা ছেড়ে, দূরে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে – আত্মগোপন করে থেকেছে সেখানে, কিংবা দিনে দিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। খাবারেরও আর অভাব হয়নি তার, কারণ পাথরের ওপর থেকে ভোগ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দেখে ধর্মভীরু লোকজন প্রচুর পরিমাণে খাবারদাবার এনে সেখানে নিয়মিত রেখে গেছে।

কিন্তু, হায়! এ বড়ো ভয়াবহ জীবন। বনের অন্ধকার আর নির্জনতার সঙ্গে নিজের দুঃখবেদনা মিলেমিশে কখনও কখনও তাকে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে। প্রায়ই ইচ্ছে করে জীবন বিসর্জন দিয়ে দিতে। তবু সে বেঁচে থাকে। কারণ তার বাবা মারা গেছে বলে ধরে নেয়া গেলেও যে-মৃতদেহটা সে দেখেছে সেটা নাহুনের নয় – আর সেখানেই তার হৃদয়ের গভীরে আশার একটি আলোকবিন্দু এখনও জেগে আছে।

তবে কিসের আশায় সে রয়েছে তা নানিয়া বলতে পারবে না।

* * *

ফিলিপ হ্যাডেন যখন সভ্যজগতে পৌঁছলো, দেখলো রাণী এবং আমাজুলুদের রাজা সেটিওয়েইয়োর মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা হতে আর বেশি বাকি নেই। আরও লক্ষ করলো, বিরাজমান উত্তেজনার ভেতর ইউট্রেখ্‌টের দোকানির সঙ্গে তার তুচ্ছ বিবাদের কথা চাপা পড়ে গেছে, কিংবা লোকে সে-কথা ভুলেই গেছে।

চমৎকার দুটো ওয়্যাগনের মালিক এখন হ্যাডেন। আর জুলুল্যান্ডের ভেতর অগ্রসর হওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ সৈন্যদলগুলোর জন্য সামরিক রসদ বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে যানবাহনের চাহিদাও রয়েছে বেশ। সত্যি বলতে কি, পরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ওয়্যাগনের জন্য মাসে ৯০ পাউন্ড ভাড়া দিতে সানন্দে রাজি। এছাড়া গবাদিপশুর যে-কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার নিশ্চয়তাও রয়েছে। জুলুল্যান্ডে ফেরার কোন বাসনা হ্যাডেনের ছিল না, কিন্তু এই লোভ সংবরণ করা কঠিন হলো তার জন্য। কমিসারিয়্যাটের কাছে ওয়্যাগনদুটো শর্তানুযায়ী ভাড়া দিয়ে দিলো সে, সেইসঙ্গে নিজেও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওয়্যাগন পরিচালক ও দোভাষীর কাজে নিযুক্ত হয়ে গেল।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন আক্রমণকারী বাহিনীর ৩ নম্বর কলামের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হলো। ১৮৭৯ সালের ২০ জানুয়ারি হ্যাডেন সেনাদলের সঙ্গে রোর্কস্‌ ড্রিফট্‌ থেকে ইনদেনি অরণ্য পর্যন্ত চলে যাওয়া রাস্তা ধরে রওনা হয়ে গেল। সে-রাতে শিবির স্থাপন করা হলো ইসান্দ্‌হোয়ানা নামের খাড়া নির্জন পর্বতের অন্ধকারময় পাদদেশে।

সেই একই দিনে রাজা সেটিওয়েইয়োরও বিশ হাজারের বেশি সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী উপিনদো পাহাড় বেয়ে নেমে এসে ইসান্দ্‌হোয়ানার দেড় মাইল পুবদিকের পাথুরে সমতলভূমিতে তাঁবু ফেললো। কোন আগুন না জ্বেলে নিশ্ছিদ্র নীরবতার সঙ্গে তারা অপেক্ষা করে রইলো – যোদ্ধারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত যে-কোন মুহূর্তে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

সেই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গেই রয়েছে সাড়ে তিন হাজার যোদ্ধার উমসিট্‌য়্যু সেনাদল। ভোরের আলোর আভাস মাত্র দেখা দিয়েছে। উমসিট্‌য়্যুর নেতৃত্বে রয়েছে যে-ইনদুনা সে শরীর আবৃত করে রাখা কালো ঢালের আশ্রয়ের আড়াল থেকে চোখ তুলে তাকালো। ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে সে দেখতে পেলো বিশালাকার একজন মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটা মুচা পরিহিত বিশীর্ণ কঠোর চেহারার লোকটার চোখে বন্য দৃষ্টি, হাতে ধরা একটা এবড়োখেবড়ো মুগুর। প্রশ্ন করা হলেও লোকটা কোন উত্তর দিলো না; শুধু মুগুরের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অসংখ্য ঢালের ঘন পঙ্‌ক্তি বরাবর বাঁ থেকে ডানে দৃষ্টি বোলাতে লাগলো।

'কে এই *সিলওয়ানা* (বন্য প্রাণী)?' বিস্মিত ইনদুনা তার সেনাপতিদের কাছে জানতে চাইলো।

সেনাপতিরা অবাক হয়ে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত তাদের একজন উত্তর দিলো:

'এ হচ্ছে নাহুন-কা-জমবা। জমবার এই ছেলে অল্প কিছুদিন আগেও এই উমসিট্‌য়্যু বাহিনীর উঁচু একটি পদে ছিল। তার বাগ্‌দত্তা ছিল উমগোনার মেয়ে

নানিয়া। কৃষ্ণপ্রবরের আদেশে নানিয়া আর তার বাবাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। সেই দৃশ্য চোখে দেখে শোকেদুঃখে নাহুন পাগল হয়ে যায় – স্বর্গের আগুন ঢুকে পড়ে তার মাথায়। আর তারপর থেকেই সে উন্মাদ অবস্থায় ঘুরে বেড়িয়েছে।'

'এখানে কী চাও তুমি, নাহুন-কা-জমবা?' ইনদুনা জিজ্ঞেস করলো।

এবার ধীর স্বরে কথা বলতে শুরু করলো নাহুন। 'আমার সেনাদল শাদা মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে; হে রাজার সেনাপতি, আমাকে ঢাল আর একটা বর্শা দিন, যাতে আমার দলের সঙ্গে আমিও লড়াই করতে পারি। যুদ্ধে একটা মুখের সন্ধান করছি আমি।'

ঢাল আর একটা বর্শা দেয়া হলো তাকে। কারণ স্বর্গের অগ্নিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে যার মস্তক, তাকে ফিরিয়ে দেবার সাহস কারও হলো না।

* * *

সেদিন সূর্য যখন উঁচুতে উঠে এসেছে, বুলেট এসে পড়তে শুরু করলো উমসিটয়্যু বাহিনীর ভেতর। তারপরই কালো ঢালধারী আর কালো পালকের চূড়ায় সজ্জিত উমসিট্য়্যু যোদ্ধারা দলে দলে জেগে উঠতে থাকলো। তাদের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো গোটা বিশাল জুলু সৈন্যবাহিনী, অসংখ্য বর্শার চলমান ঝলকানির রূপ নিয়ে নিঃশব্দে চড়াও হলো বিপন্ন ব্রিটিশ শিবিরের ওপর। ঢালের ওপর সশব্দে আছড়ে পড়ছে বুলেটের রাশি, একেকটা গোলা ছুটে এসে যোদ্ধাদের সারি ছিঁড়েখুঁড়ে দীর্ঘ রেখা এঁকে দিচ্ছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও থামছে না তারা, একটুও বিচ্যুত হচ্ছে না পথ থেকে।

সামনে দু'পাশ থেকে সশস্ত্র সৈনিকদের দুটো দল শিঙের আকৃতিতে দ্রুত আগ বাড়িয়ে ব্রিটিশ শিবিরকে ইস্পাত-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ফেললো। তারপর যখন তারা দু'দিক থেকে চেপে আসতে শুরু করলো, রণহুঙ্কারে ফেটে পড়লো জুলুরা। প্রবল জলস্রোতের গর্জন নিয়ে ঝঞ্ঝার বেগে লক্ষ-কোটি মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শব্দ তুলে অসংখ্য যোদ্ধা ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে লাগলো শাদা মানুষদের ওপর। তাদের মধ্যে রয়েছে কালো ঢালধারী উমসিট্য়্যু বাহিনী, আর এ-বাহিনীতেই আছে জমবার পুত্র নাহুন।

একটা বুলেট এসে লাগলো নাহুনের দেহের একপাশে, পাঁজরের হাড় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। ভ্রূক্ষেপ করলো না সে। তার সামনে একজন শাদা মানুষ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। বর্শাবিদ্ধ করলো না তাকে। কারণ যুদ্ধের ভেতর সে অনুসন্ধান করছে একটিমাত্র মুখের।

খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত নাহুন পেয়ে গেল তাকে। ওই তো, ওয়্যাগনের সারির মধ্যে যেখানে বর্শার রাশি সবচেয়ে ব্যস্ত, সেখানে নিজের ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত গুলি ছুঁড়ে চলেছে কালো মন – যে তার বাগ্‌দত্তা নানিয়াকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। মাঝখানে তিনজন সৈন্য। একজনকে

বর্শাবিদ্ধ করলো নাহুন, অন্য দু'জনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সোজা ধেয়ে গেল হ্যাডেনের দিকে।

কিন্তু তাকে আগেই আসতে দেখে ফেলেছে হ্যাডেন, এবং উন্মত্ত চেহারা সত্ত্বেও চিনতে পেরেছে তাকে। আতঙ্ক গ্রাস করলো হ্যাডেনকে। গুলি শেষ হয়ে গেছে, শূন্য রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়লো, সেটার পেটে জোরে আঘাত করলো গোড়ালি দিয়ে। হত্যাযজ্ঞের ভেতর দিয়ে ছুট দিলো ঘোড়া, লাফিয়ে লাফিয়ে সৈনিকদের মৃতদেহ ডিঙিয়ে ঢালের সারি ভেদ করে ধেয়ে চললো। নাহুনও পিছু ধাওয়া করলো। নিচু হয়ে মাথা সামনে বাড়িয়ে বর্শা হাতে ঝুলিয়ে ছুটছে সে, যেন হরিণ দেখতে পেয়ে তাড়া করেছে হাউণ্ড।

হ্যাডেন প্রথমে ভেবেছিল রোর্কস্ ড্রিফ্টের দিকে যাবে, কিন্তু বাঁয়ে এক নজর তাকিয়েই বুঝলো উনডি বাহিনীর যোদ্ধারা সেদিকটা অবরোধ করে রেখেছে। কাজেই পথ কোথায় নিয়ে যাবে তা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে সোজা সামনের দিকে ছুটে চললো সে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা শৈলশিরার ওপর এসে পড়লো। যুদ্ধের কোন চিহ্নই আর এখানে দৃশ্যমান নেই। দশ মিনিটের মধ্যে লড়াইয়ের সমস্ত শব্দও ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। প্রকৃতির যে প্রশান্ত বিস্তারের মধ্য দিয়ে এখন এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে পেছনে ফেলে আসা রক্ত আর সংঘাতের বিভীষিকাময় দৃশ্যের যে বৈসাদৃশ্য, তা এ-রকম মুহূর্তেও অদ্ভুত কোন উপায়ে হ্যাডেনের মস্তিষ্কে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়লো। পাখিরা গান গাইছে এখানে, গরুবাছুর চরে বেড়াচ্ছে। এখানে কামানের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন নয় সূর্যের উজ্জ্বল আলো। কেবল নিঃশব্দ নীল আকাশের অনেক উঁচুতে দেখা যাচ্ছে শকুনের দীর্ঘ সারি, ডানা মেলে তারা উড়ে চলেছে ইসান্দ্লোয়ানার সমতলভূমির দিকে।

মাটি এদিকে খুব উঁচুনিচু, ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। হ্যাডেন মুখ ঘুরিয়ে তাকালো – শ' দুয়েক গজ পেছনে ধেয়ে আসছে জুলু নাহুন, মৃত্যুর মতো ভয়াল, নিয়তির মতো অমোঘ। বেল্টে ঝোলানো পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখলো; একটামাত্র কার্তুজ অবশিষ্ট আছে, বাকি সবগুলো খরচ হয়ে গেছে – পাউচ্ও শূন্য। তা হোক, একটা জংলীর জন্য একটা বুলেটই যথেষ্ট হওয়ার কথা। প্রশ্ন হচ্ছে, থেমে দাঁড়িয়ে এখনই কি সেটা ব্যবহার করবে? না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে গুলি, কিংবা লোকটা মারা নাও পড়তে পারে। সে নিজে ঘোড়ার পিঠে, আর শত্রু আসছে পায়ে ভর করে। নিশ্চয় জুলুটাকে ছুটিয়ে পরিশ্রান্ত করে ফেলা যাবে।

আরও কিছুক্ষণ কাটলো। ছুটতে ছুটতে দু'জন ছোট একটা জলধারা পার হয়ে গেল। জায়গাটা পরিচিত মনে হলো হ্যাডেনের। হ্যাঁ, নানিয়ার বাবা উমগোনার অতিথি থাকতে এই জলাশয়েই সে স্নান করতো। আর ওই তো ডানদিকে গোলাকার টিলার ওপর দেখা যাচ্ছে ঘরগুলো, কিংবা বলা যায় ঘরগুলোর ধ্বংসাবশেষ, কারণ আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সেগুলো। অদৃষ্টের কোন্ ফের তাকে এখানে টেনে এনেছে কে জানে! আবার মাথা ঘুরিয়ে নাহুনের দিকে তাকালো হ্যাডেন। কী ভাবছে সে তা যেন নাহুন টের পেয়ে গেছে, কারণ বর্শা নেড়ে ইশারায় পুড়িয়ে দেয়া ক্রাল দেখালো সে।

বেশ জোরে ছুটে চলেছে এখন হ্যাডেন, কারণ মাটি এখানে সমতল। পেছনে নাহুন দৃষ্টির আড়ালে পড়ে গেছে দেখে খুশি হয়ে উঠলো সে। কিন্তু একটু পরেই মাইলখানেক বিস্তৃত পাথুরে জমি এসে পড়লো। জায়গাটা পার হয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেলো, নাহুন আবার সেই আগের দূরত্বের ভেতর এসে পড়েছে।

ঘোড়াটার শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু পেটে গোড়ালি ঠুকে অন্ধের মতো সেটাকে সামনে তাড়িয়ে নিয়ে চললো হ্যাডেন – জানে না কোথায় চলেছে। এখন সে ছুটছে এক ফালি ঘাসে-ছাওয়া জমির ওপর দিয়ে। সামনের দিক থেকে নদীর কুলুকুলু ধ্বনি ভেসে আসছে, বাঁ পাশে উঠে গেছে উঁচু একটা চড়াই।

একটু পরে ঘাসে-ঢাকা জমির ফালি বাঁয়ে বেঁকে যেতেই দেখা গেল, তার কাছ থেকে বিশ গজ দূরেও হবে না, নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে একটা কাফ্রি কুঁড়েঘর। ঘরটার দিকে তাকালা সে – হ্যাঁ, এ তো সেই হতচ্ছাড়া *ইন্‌ইয়াংগা*, মানে মৌমাছি-র ঘর। আর ঘরের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর কেউ নয়, স্বয়ং মৌমাছি।

বুড়িকে দেখামাত্র পরিশ্রান্ত ঘোড়াটা ভয়ানক চমকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে লাফিয়ে উঠলো, পা হড়কে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে, তারপর শুয়ে হাঁপাতে লাগলো। হ্যাডেন জিন থেকে ছিটকে পড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কোন আঘাত পায়নি সে।

'আরে, কালো মন নয় ওটা? লড়াইয়ের খবর কী, কালো মন?' উপহাসের স্বরে বলে উঠলো মৌমাছি।

'বাঁচাও আমাকে, বুড়িমা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো হ্যাডেন, 'আমাকে ধাওয়া করেছে।'

'তাতে কী হয়েছে, কালো মন, পিছু নিয়েছে তো ক্লান্ত একজন মানুষ। শক্ত পায়ে দাঁড়াও না কেন, তার মোকাবেলা করো – কারণ আবার এখন এক হয়েছে কালো মন আর শাদা মন। চাও না ওর মুখোমুখি হতে? তাহলে যাও চলে ওই অরণ্যে, সেখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে যে মৃতের দল তাদের মধ্যে আশ্রয় খোঁজো গিয়ে। বলো, বলো, জলের নিচে যে-মুখ আমি কিছুদিন আগে দেখতে পেয়েছি সে কি নানিয়ার? বেশ! প্রেতনিবাসে যখন তোমাদের দু'জনের দেখা হবে, তাকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ পৌঁছে দিয়ো।'

হ্যাডেন নদীর দিকে তাকালো। বান এসেছে নদীতে, সাঁতরে পার হতে পারবে না। কাজেই বনের দিকে ছুটতে শুরু করলো সে, পেছন থেকে ভেসে আসতে থাকলো গুনিন বুড়ির অশুভ হাসির শব্দ। নাহুনও আসছে পিছু পিছু, তার জিভ চোয়ালের ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়েছে নেকড়ের জিভের মতো।

জঙ্গলের গাছপালার ভেতর এখন হ্যাডেন, তবু নদীর গতিপথ বরাবর ছুটে চলেছে। শেষ পর্যন্ত দম ফুরিয়ে গেল তার, বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। সেখান থেকে একটু দূরে প্রকাণ্ড একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। যতো দূর থেকে বর্শা ছুঁড়ে মারা যায়, পেছনে নাহুন

তার চেয়ে দূরে রয়েছে। কাজেই পিস্তল বের করে প্রস্তুত হয়ে নেবার সুযোগ পেলো হ্যাডেন।

'দাঁড়াও, নাহুন!' চিৎকার করে বললো সে, আগে একবার যেমন বলেছিল। 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

তার গলা শুনতে পেয়েছে জুলুটা। থেমে দাঁড়ালো।

'শোনো,' বললো হ্যাডেন। 'পাল্লা দিয়ে অনেক পথ ছুটেছি আমরা, অনেক লড়েছি তুমি আর আমি। তারপরও বেঁচে আছি – দু'জনই। যদি আর এগোও, খুব শিগ্‌গির আমাদের একজনকে অবশ্যই মারা পড়তে হবে – এবং যে মরবে সে হবে তুমিই, নাহুন। কারণ অস্ত্র আছে আমার কাছে, আর তুমি তো জানো আমার হাতের নিশানা অব্যর্থ। এবার বলো তুমি কী বলবে।'

নাহুন কোন উত্তর দিলো না, খোলা জায়গার প্রান্ত ঘেঁষে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। শাদা মানুষটার মুখের ওপর নিবদ্ধ তার বন্য রুদ্র দৃষ্টি, হাঁপিয়ে যাওয়ায় নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

'চলে যেতে দেবে আমাকে, যদি আমি তোমাকে নিরাপদে চলে যেতে দিই?' হ্যাডেন আবারও বললো। 'আমার ওপর তোমার আক্রোশের কারণ আমি জানি, কিন্তু অতীত তো বদলে দেয়া যায় না, মৃত মানুষকে পৃথিবীতে আবার ফিরিয়ে আনাও সম্ভব নয়।'

এবারও নাহুন কোন উত্তর দিলো না। কোন কথার চেয়ে তার নীরবতাই অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, অনেক বেশি তীব্র কঠোর মনে হচ্ছে – মুখের কথায় উচ্চারিত কোন অভিযোগ হ্যাডেনের কানে এতখানি ভয়াবহ হয়ে বাজতো না। কোন উত্তর না দিয়ে নাহুন অ্যাসেগাই উঁচিয়ে করাল মূর্তি নিয়ে ধীর পায়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হলো।

যখন পাঁচ কদমের মধ্যে এসে পড়লো সে, হ্যাডেন পিস্তল তুললো তার দিকে – গুলি ছুঁড়লো। লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল নাহুন। কিন্তু গুলিটা লেগেছে তার দেহের কোথাও, কারণ তার ডান হাত শিথিল হয়ে ঝুলে পড়লো, আর সে-হাত থেকে বর্শাটা ছিটকে বেরিয়ে শাদা মানুষটার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল তাকে অক্ষত রেখে।

কিন্তু এবারও কোন শব্দ না করে নাহুন দ্রুত এগিয়ে গেল সামনে, বাঁ হাতে হ্যাডেনের গলা চেপে ধরলো দৃঢ়মুষ্টিতে। ভয়ানক ধস্তাধস্তি চললো কিছুক্ষণ – দু'জন একবার সামনে একবার পেছনে হেলে পড়ছে। তবে হ্যাডেন অক্ষতদেহ রয়েছে এবং সে লড়ছে আশাভঙ্গের তীব্র আক্রোশ নিয়ে। অন্যদিকে নাহুন দু'বার আহত হয়েছে, এবং লড়বার জন্যে তার সুস্থ হাত রয়েছে মাত্র একটা। শাদা মানুষটার ইস্পাত-শক্তি কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ধরাশায়ী করে ফেললো। পরাভূত সৈনিক আর উঠে দাঁড়াতেও পারলো না।

'এবার শেষ রফা হবে আমাদের,' হিংস্র স্বরে বিড়বিড় করে বললো হ্যাডেন। অ্যাসেগাইটা খুঁজে দেখবে বলে ঘুরে দাঁড়ালো। অমনি দু'চোখ বিস্ফারিত

হয়ে উঠলো তার, টলতে টলতে এলোমেলো পায়ে ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসতে থাকলো। তার চোখের সামনেই সেই শাদা আঙরাখা পরে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে নানিয়ার প্রেতাত্মা!

ইন্‌ইয়াংগা-র কথাগুলো আবছাভাবে মনে এলো হ্যাডেনের। 'আমার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ ক'রো,' মনে মনে আওড়ালো সে, 'প্রেতনিবাসে প্রেতাত্মার মুখোমুখি দাঁড়াবে যখন।'

একটা চিৎকার শুনতে পেলো সে, সেইসঙ্গে ঝল্‌সে উঠলো ইস্পাত – চওড়া বর্শাটা লাফিয়ে উঠে ধেয়ে এলো তার দিকে, বুকের ভেতরে গেঁথে গেল। টলতে থাকলো হ্যাডেন, পড়ে গেল মাটিতে।

যে মহাপুরস্কারের কথা মৌমাছি বলেছিল তার ভবিষ্যদ্বাণীতে, তা দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো কালো মন।

* * *

'নাহুন! নাহুন!' মিষ্টি একটা কণ্ঠ ডাকছে মৃদু শব্দে, 'চোখ মেলে তাকাও, ভূতপ্রেত নই আমি, আমি নানিয়া – তোমার জীবন্ত স্ত্রী। আমার *এহ্‌লোস* (রক্ষক প্রেতাত্মা) তোমাকে বাঁচানোর ভার দিয়েছিল আমারই হাতে।'

কথাগুলো শুনতে পেলো নাহুন। চোখ মেলে তাকালো সে। সঙ্গে সঙ্গে তার অপ্রকৃতিস্থতা দূর হয়ে গেল।

'স্বাগতম, নানিয়া,' ক্ষীণ স্বরে বলে উঠলো সে, 'মৃত্যুদূত এই প্রেতনিবাসে তোমাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে আমার কাছে – এখন আমি বেঁচে থাকতে চাই।'

* * *

আজ নাহুন জুলুল্যান্ডে ইংরেজ সরকারের ইনদুনাদের একজন। তার ক্রালে শিশুদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এ-কাহিনীর কথক গল্পের বিষয়বস্তু শুনতে পেয়েছেন আর কারও কাছ থেকে নয়, নাহুনেরই স্ত্রী নানিয়ার মুখ থেকে।

মৌমাছিও বেঁচে আছে। শাদা মানুষদের শাসনাধীনে যতোটা সাহসে কুলোয় ততোটা চর্চা করে জাদুবিদ্যার। তার কালো হাতে শোভা পায় সাপের আকৃতিতে গড়া একটা সোনার আংটি। সাপের চোখদুটো পদ্মরাগমণি দিয়ে তৈরী। ছোট্ট এই অলঙ্কারটুকু নিয়ে ভারী গর্ব মৌমাছির।